ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয়কো কারো ‘পরে

The Ahmadi Fortnightly

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

পাক্ষিক
আহ্‌মদী

নব পর্যায় ৭৫ বর্ষ | ২য় সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ১৬ শ্রাবণ, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ | ১১ রমযান, ১৪৩৩ হিজরি | ৩১ ওয়াফা, ১৩৯১ হি. শা. | ৩১ জুলাই, ২০১২ ঈসাব্দ

এই সংখ্যাতে আছে:

- হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) প্রদত্ত ৬ জুলাই ২০১২-এর জুমুআর খুতবা
- হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) প্রদত্ত ১৫ অক্টোবর ২০০৪-এর জুমুআর খুতবা
- হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) প্রদত্ত ২১ সেপ্টেম্বর ২০০৯-এর ঈদ-উল-ফিতরের খুতবা
- ওয়াকফে আরযী সাময়িকভাবে জীবন উৎসর্গ করার অসাধারন এক ব্যবস্থাপনা
- চলে গেলেন প্রফেসর রাজিব উদ্দিন ও শফিক আহমদ
- লাইলাতুল কদর
- রোযা পালনে রুগ্ন ও মুসাফিরের ব্যাপারে ইসলামী শিক্ষা
- রোযা দৈহিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশ ঘটায়
- বাংলার কিংবদন্তি
  জার্মানীর প্রথম মিশনারী
  খান সাহেব মৌলভী মোবারক আলী

রমযান মুবারাক

Luxury Forever...

Bashundhara	Dhanmondi	Zigatola	Nurer Chala	Mirpur	Nordha
Size : 1285-1750 sft	Size : 1350 sft	Size : 1285 sft	Size : 1210-1215 sft	Size : 1275-1350 sft	Size : 1165-1350 sft

Land Wanted

Hot Line : 01817-033388, 01819-296797, 01817-143100

কৌশিক প্রপার্টিজ লিঃ

Member | REHAB

Kounik Properties Ltd

Corporate Office : Safwan Road, House # 193, Level # 6, Block # B, Bashundhara, Baridhara, Dhaka-1229, Bangladesh.

LOVE FOR ALL, HATRED FOR NONE

Veronica tours & travels

Travel Agent & Tour Operator

Muhammad Belal Ahmad (Tushar)
ceo

VERONICA TOURS & TRAVELS
207/2, West Kafrul, Begum Rokeya Swarani, Mirpur, Dhaka-1207
Phone: 88 02 9113176, Cell: 01733 004412, 01552 403395, E-mail: veronica@ithbd.com, tusharith@gmail.com

Our Sister Concern:
International Trading House (Garments Accessories Supplier),Hafsa Fashion Ltd. (Readymade Garments Manufacturer)
Awl Fashion (Buying Office), Color Clouds (Arts & Craft House), Bakers Bay (Bakery & Sweets)

Amecon
Since 1983
www.amecon-bd.net

Our Activities
- Crest
- Trophy
- Sign Board
- Metal Sign
- Acrylic Letter
- POP & Interior
- Digital Printing

MEMBER ARA

H-79/3, Block-E, Chairman Bari, Banani, Dhaka-1213
Tel: 8824945, 9895686, 03792003208, Fax: 880-2-8824945
E-mail: amecon2007@yahoo.com, amecon2008@gmail.com

AMECON NIAZ METALLIC

Meer Hasan Ali Niaz
Founder

Mobile: 01713001536, 01973001536

H - 79, Block # H / 11, Banani Chairman Bari,
Zia Int'l Airport Road, Dhaka Tel : 9861046, 8856075, 8812459, Fax:8856075

Jessore Office	Bogra Office	Chittagong Office
Palbari More, New Khairtola	Kanas Gari, Sherpur Road	205, Baizid Bostami Road
Jessore. Tel : 67284	Bogra. Tel : 73315	Ctg. Tel : 682216

ameconniaz@yahoo.com

সম্পাদকীয়

mPxc Î

মুসলিম ফিরকাগুলোর জন্য চিন্তার খোরাক

বনী ইসরাইলি নবী হযরত ঈসা (আ.) কে অস্বীকারকালে ইহুদী আলেমরা বলত, খোদা তাআলা কিয়ামতের দিন যদি আমাদের জিজ্ঞাসা করেন কেন তোমরা এই ব্যক্তিকে গ্রহণ করনি, তখন আমরা মালাকী নবীর কিতাব তাঁর সম্মুখে মেলে দিয়ে বলব, যতদিন পর্যন্ত ইলিয়াস নবী পুনরায় পৃথিবীতে আগমন না করবেন ততদিন পর্যন্ত বনী ইসরাইলদের সাথে ওয়াদাকৃত নবী দ্বিতীয়বার পৃথিবীতে আগমন করেননি। কারণ আমাদের একথা বলা হয়নি যতদিন পর্যন্ত ইলিয়াসের সাদৃশ্যপূর্ণ কেউ আগমন না করবেন ততদিন পর্যন্ত সত্য মসীহ্ আগমন করবেন না। বরং আমাদের বলা হয়েছিল যে, সত্য মসীহের পূর্বে যথার্থভাবে ইলিয়াসের পুনরাগমন জরুরী। কিন্তু সেই কথা পূর্ণ হয়নি।

যে সময়ে হযরত ঈসা (আ.) আগমন করেছিলেন ইহুদীরা তখন অনেক ফিরকায় বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল এবং প্রত্যেক ফিরকা অন্য ফিরকার বিরুদ্ধবাদী ছিল। তাদের মধ্যে কঠোর পারস্পরিবক শত্রুতা এবং কলহ-বিবাদ সৃষ্টি হয়েছিল এবং তাদের মতভেদের আধিক্যের দরুণ তওরাতের অধিকাংশ বিধি-নিষেধ সন্দেহজনক হয়ে পড়েছিল। কেবলমাত্র খোদার একত্ব সম্বন্ধে তারা পারস্পরিক ঐক্যমত পোষণ করত। অবশিষ্ট অধিকাংশ ছোট-ছোট মসলা-মাসায়েলের ক্ষেত্রে তারা একে অন্যের শত্রু ছিল। কোন উপদেষ্টা তাদের পরস্পরের মধ্যে আপোষ-মীমাংসা করতে পারত না। এমতাবস্থায় তারা একজন স্বর্গীয় হাকিম অর্থাৎ, মীমাংসাকারীর মুখাপেক্ষী ছিল, যিনি খোদার কাছ থেকে তাজা ওহী প্রাপ্ত হয়ে সত্যবাদীদের সমর্থন করবেন। কিন্তু আল্লাহ্‌র অমোঘ বিধানে তাদের সকল ফিরকার মধ্যে এরূপ গোমরাহীর মিশ্রণ ঘটেছিল যে তাদের মধ্যে একজনকেও সত্যাশ্রয়ী বলা যেত না। প্রত্যেক ফিরকার মধ্যে কিছু না কিছু মিথ্যা এবং ধর্ম সম্বন্ধে অতি হ্রাস-বৃদ্ধির প্রবণতা বিদ্যমান ছিল। সুতরাং এই কারণটিই সৃষ্টি হয়েছিল যে, ইহুদীদের সকল ফিরকা হযরত মসীহকে দুশমন প্রমাণ করেছিল এবং তাঁর প্রাণ হরণ করার চেষ্টায় লিপ্ত ছিল। কেননা, প্রত্যেক ফিরকা চাইত, হযরত মসীহ্ সম্পূর্ণরূপে তাদের সত্যায়নকারী হোক এবং তাদের ন্যায়নিষ্ঠ ও পুণ্যবান মনে করুক এবং তাদের বিরুদ্ধবাদীদের মিথ্যাবাদী বলুক। কিন্ত এরূপ মনোরঞ্জন খোদা তাআলার নবীর পক্ষে অসম্ভব ছিল।

মহানবী (সা.) এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) এর আবির্ভাবকালের এ যুগে বিদ্যমান মুসলিম ফিরকাগুলো নিশ্চয়ই এ থেকে চিন্তার খোরাক পাবেন আর সত্যানুসন্ধিৎসু পাবেন পথের দিশা।

৩১ জুলাই ২০১২

কুরআন শরীফ	২
হাদীস শরীফ	৩
অমৃত বাণী	৪
৬ জুলাই ২০১২-এ প্রদত্ত **জুমুআর খুতবা** হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)	৫
১৫ অক্টোবর ২০০৪-এ প্রদত্ত **জুমুআর খুতবা** হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)	১১
২১ সেপ্টেম্বর ২০০৯-এ প্রদত্ত **ঈদ-উল-ফিতরের খুতবা** হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)	১৮
ওয়াকফে আরযীসাময়িকভাবে জীবন উৎসর্গ করার অসাধারন এক ব্যবস্থাপনা আলহাজ্জ মওলানা সালেহ্ আহমদ	২০
লাইলাতুল কদর মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ্	২৩
রোযা পালনে রুগ্ন ও মুসাফিরের ব্যাপারে ইসলামী শিক্ষা মওলানা জাফর আহমদ	২৫
রোযা দৈহিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশ ঘটায় মাহমুদ আহমদ সুমন	২৭
বাংলার কিংবদন্তি **জার্মানীর প্রথম মিশনারী খান সাহেব মৌলভী মোবারক আলী** মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল	২৮
চলে গেলেন প্রফেসর রাজিব উদ্দিন ও শফিক আহমদ আহমদ তবশির চৌধুরী	৩১
পাঠক কলাম	৩৩
সংবাদ	৩৬
বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী জুবিলী ২০১৩ পালনের জন্যে দোয়া ও ইবাদতের আধ্যাত্মিক কর্মসূচী	৩৯
এম.টি.এ-এর বাংলা সময়সূচী	৪০

কুরআন শরীফ

সূরা বাকারা-২

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ بَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَ الْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ؕ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ؕ يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿۱۸۶﴾

১৮৬। রমযান[২০৭ক] সেই মাস যাতে (বা যার সম্পর্কে) কুরআন অবতীর্ণ[২০৭খ] করা হয়েছে। (এ কুরআন) মানবজাতির জন্য[২০৮] এক মহান হেদায়াতরূপে এবং হেদায়াতের সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী ও সত্য মিথ্যার পার্থক্যকারীরূপে (অবতীর্ণ করা হয়েছে) অতএব তোমাদের মাঝে যে এ মাসকে পাবে সে যেন এতে রোযা রাখে। কিন্তু যে অসুস্থ অথবা সফরে থাকে তাকে অন্যান্য দিনে[২০৯] (রোযার এ) সংখ্যাপূর্ণ করতে হবে। আল্লাহ্ তোমাদের জন্য স্বাচ্ছন্দ্য চান এবং তোমাদের জন্য কাঠিন্য চান না। আর তিনি চান তোমরা যেন (রোযার নির্ধারিত) সংখ্যা পূর্ণ কর। আর তিনি যে তোমাদের হেদায়াত দান করেছেন সেজন্য তোমরা আল-াহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর যেন তোমরা তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

২০৭-ক। 'রমযান' চান্দ্রমাসগুলোর নবম মাস। শব্দটি 'রামাযা' ধাতু থেকে উৎপন্ন। 'রামাযাস্ সায়িমু' অর্থ রোযা রাখার দরুন রোযাদারের ভিতরটা তৃষ্ণায় উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে (লেইন)। মাসটির নামকরণ এ কারণে হয়েছে : (১) রোযার কারণে এ মাসটিতে মানুষের তৃষ্ণা ও জ্বালা বৃদ্ধি পায়, (২) এ মাসের ইবাদত-বন্দেগী মানুষের পাপকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে নি:শেষ করে দেয়, (আসাকির ও মারদাওয়াই), (৩) এ মাসে মানুষের তপস্যা ও সাধনা তার মনে স্রষ্টার প্রতি ভালবাসার উত্তাপ সৃষ্টি করে এবং মানবের প্রতি সহানুভূতির উদ্রেক করে। 'রমযান' নামটি ইসলামের অবদান। এ মাসটির পূর্বনাম ছিল 'নাতিক' (কাসীর)।

২০৭-খ। রমযান মাসের ২৪ তারিখে হযরত রাসূল করীম (সা.) প্রথম আল্লাহ্‌র বাণী পেয়েছিলেন (জরীর)। এ রমযান মাসেই জিবরাঈল প্রতি বছরে পূর্বে অবতীর্ণ হওয়া সমস্ত বাণী রাসূল করীম (সা.) এর কাছে পুনরাবৃত্তি করতেন। এ ব্যবস্থা মহানবী (সা.) এর জীবনের শেষ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। তাঁর জীবনের শেষ বছরের রমযান মাসে জিবরাঈল পূর্ণ কুরআনকে মহানবী (সা.) এর কাছে দু'বার পাঠ করে শুনান (বুখারী)। এ হিসাবে বলা যেতে পারে, সমগ্র কুরআনই রমযান মাসে অবতীর্ণ হয়েছে।

২০৮। 'আল কুরআন' শব্দটি 'কারায়া' হতে উৎপন্ন। 'কারায়া' অর্থ সে পাঠ করেছিল, সে বাণী পৌঁছিয়েছিল, সে সংগ্রহ করেছিল। 'কুরআন' অর্থ : (১) পঠনের উপযোগী পুস্তক, যা বার বার পাঠ করা যায়। কুরআন বিশ্বের সর্বাধিক পঠিত পুস্তক (এনসাইকো-বৃট.), (২) একটি পুস্তক কিংবা বাণী যা পৃথিবীর সর্বত্র নিয়ে যাওয়া ও পৌঁছানো প্রয়োজন। কুরআনই একমাত্র পুস্তক যার বাণী সারা বিশ্বের জন্য সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত। কেননা যেখানে অন্যান্য অবতীর্ণ ধর্মগ্রন্থাদি স্থান, কাল ও পাত্রে সীমাবদ্ধ, সেখানে কুরআনই একমাত্র অবতীর্ণ ধর্মগ্রন্থ যা সকল দেশ, সকল জাতি ও সকল সময়ের জন্য এসেছে (৩৪ : ২৯), (৩) এমন গ্রন্থ যা সকল সত্যকে ধারণ করে। কুরআনই একমাত্র ধর্মগ্রন্থ যা যাবতীয় জ্ঞানের এক অফুরন্ত ভান্ডার। এতে অন্যান্য অবতীর্ণ গ্রন্থাবলীর শাশ্বত সত্যগুলো তো স্থান লাভ করেছেই, উপরন্ত সকল অবস্থায় সকল মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় অনেক নতুন নতুন শিক্ষা ও সত্য এতে সংযোজিত হয়ে এটা সর্বকালের জন্য পূর্ণতম গ্রন্থে পরিণত হয়েছে (৯৮ : ৪; ১৮ : ৫০)।

২০৯। এ বাক্যটি অপ্রয়োজনীয় পুনরুক্তি নয়। কেননা পূর্ববর্তী আয়াতে মনস্তাত্ত্বিক প্রস্থতির ক্ষেত্র গঠনের জন্য এ বাক্যটি ব্যবহৃত হয়েছে যাতে রোযা রাখার নির্দেশ তারা সহজে গ্রহণ করতে পারে। এ আয়াতে সেই নির্দেশেরই বাস্তবায়নকে উপলক্ষ্য করে এ বাক্যটি ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে বাক্যটি নির্দেশেরই অঙ্গ-বিশেষ। 'অসুস্থতা' 'সফর' শব্দগুলোকে সংজ্ঞায়িত না করে কুরআন মানুষের সাধারণ বুদ্ধি-বিবেচনা ও পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে শব্দগুলোর অর্থ করার ভার ছেড়ে দিয়ে বিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতা দেখিয়েছে।

হাদীস শরীফ

রমযানের শেষ দশকের বিশেষ গুরুত্ব

* হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রমযানের শেষ দশ দিন শুরু হলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সারা রাত জাগতেন, নিজের পরিবারবর্গকেও জাগাতেন এবং (আল্লাহ্‌র ইবাদতে) খুব বেশী সাধনা ও পরিশ্রম করতেন। (বুখারী ও মুসলিম)।

* হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম রমযানে (আল্লাহ্‌র ইবাদতের ক্ষেত্রে) এমন প্রচেষ্টা ও সাধনা করতেন যা অন্য কোন মাসে করতেন না। আর শেষ দশ দিনে এমন প্রচেষ্টা ও সাধনা করতেন যা অন্য সময় করতেন না (মুসলিম)।

* হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! আমি যদি জানতে পারি কোন রাতটি কদরের রাত তাহলে আমি তাতে কি বলবো?

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম জবাব দিলেন ঃ তুমি বলবে "আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুউন তুহিব্বুল আফওয়া ফা'ফু আন্নি" (অর্থাৎ –হে আল্লাহ্! তুমি অবশ্য ক্ষমাশীল, তুমি ক্ষমা পছন্দ করো, কাজেই আমাকে ক্ষমা করো)। (তিরমিযী)

* হযরত রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের নিকট রমযান এসেছে। রমযান মুবারক মাস। এর রোযা আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি ফরয করেছেন। এ মাসে আকাশের দ্বার সমূহ উন্মুক্ত করা হয়েছে, দোযখের দ্বার সমূহ বন্ধ করা হয়েছে এবং দুষ্কৃতকারী শয়তানকে শিকলে আবদ্ধ করা হয়েছে। এ মাসের একটি রাত্রি যা হাজার মাস থেকে উত্তম। এর কল্যাণ থেকে যে বঞ্চিত, সে সকল প্রকার কল্যাণ থেকে বঞ্চিত" (বুখারী, আহমদ)।

* হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন, হযরত রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি কদরের রাত্রে ঈমান সহকারে সওয়াবের আশায় ইবাদত করে, তার পূর্বের গোনাহ্ মাফ করা হয়" (বুখারী)।

রমযানের শেষ দশ রাতের বেজোড় রাতগুলোতে শবে কদরের সন্ধান করো

* হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেছেন, হযরত রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম রমযান মাসের শেষ দশ দিন মসজিদে ইতেকাফে বসতেন, এবং বলতেন, রমযান মাসের শেষ দশ রাত্রির ভিতর লাইলাতুল কদরের অনুসন্ধান করো" (বুখারী, মুসলিম)।

* হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেছেন, হযরত রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "রমযানের শেষ দশ রাতের বেজোড় রাতগুলোতে শবে কদরের সন্ধান করো" (বুখারী)।

সংকলনঃ
আলহাজ্জ মওলানা সালেহ আহমদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী

অহংকারের লেশ মাত্রও অবশিষ্ট থাকলে হৃদয়ের সমস্ত জ্যোতি নষ্ট হয়ে যায়

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

তোমরা আল্লাহ্‌র অভিসম্পাতকে ভয় কর, যা আকাশ হতে অবতীর্ণ হয় এবং যার উপর তা নিপতিত হয়, তার ইহকাল ও পরকালকে সমূলে বিনষ্ট করে। তুমি কপটতা দ্বারা নিজেকে রক্ষা করতে পারবে না, কারণ যিনি তোমাদের খোদা, তিনি মানব হৃদয়ের অন্ত:স্থল পর্যন্ত দেখে থাকনে। তোমরা কি তাঁকে প্রতারণা করতে পার? সুতরাং তোমরা পরিষ্কার, সরল, পবিত্র এবং নির্মল হয়ে যাও। যদি তোমাদের মধ্যে অহংকারের লেশ মাত্রও অবশিষ্ট থাকে, তবে তা তোমাদের হৃদয়ের সমস্ত জ্যোতিকে নষ্ট করে দিবে। যদি তোমাদের হৃদয়ের কোন অংশে অহঙ্কার, কপটতা, আত্মশ্লাঘা বা আলস্য বর্তমান থাকে, তবে তোমরা আদৌ তাঁর গ্রহণযোগ্য হবে না।

দেখ, তোমরা মাত্র কয়েকটি কথা শিখে যেন আত্মপ্রতারণা না কর যে, তোমরা তোমাদের কর্তব্য সাধন করেছ। আল্লাহ্ তাআলা চাহেন যেন তোমাদের জীবনে আমূল পরিবর্তন আসে। তিনি তোমাদের নিকট হতে এক মৃত্যু চাহেন। এরপর তিনি তোমাদেরকে এক নতুন জীবন দান করবেন। যত শীঘ্র সম্ভব তোমাদের পরস্পরের বিবাদ মীমাংসা করে ফেল এবং নিজ ভ্রাতাকে ক্ষমা কর। কারণ, যে ব্যক্তি আপন ভ্রাতার সাথে বিবাদ মীমাংসা করতে প্রস্তুত নয়, সে নিশ্চয় অসাধু। সে সমাজে বিভেদ সৃষ্টি করে, সুতরাং সে সম্বন্ধচ্যুত হয়ে যাবে। তোমরা নিজ নিজ রিপুর বশবর্তীতা সর্বতোভাবে পরিহার কর এবং পারস্পরিক মনোমালিন্য পরিত্যাগ কর এবং সত্যবাদী হয়েও মিথ্যাবাদীর ন্যায় বিনয়াবনত হও, যেন তোমরা ক্ষমার অধিকারী হতে পার। তোমরা রিপূর স্থূলতা বর্জন কর। কারণ, যে দ্বার দিয়ে তোমাদেরকে আহ্বান করা হয়েছে, সে দ্বার দিয়ে কোন স্থূলরিপু ব্যক্তি প্রবেশ করতে পারবে না।

কত হতভাগ্য সে ব্যক্তি, যে আল্লাহ্‌র মুখনি:সৃত বাণী যা আমার দ্বারা প্রচারিত হয়েছে, মানতে প্রস্থত নয়! তোমরা যদি ইচ্ছা কর যে, আকাশে আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন, তবে তোমরা পরস্পর সহোদর ভাইয়ের মত হয়ে যাও। তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি, যে হঠকারিতা করে এবং নিজের ভ্রাতার অপরাধ ক্ষমা করতে প্রস্থত নয়, তেমন ব্যক্তির সাথে আমার কোন সংস্রব নেই। খোদা তাআলার অভিশাপ হতে সর্বদা অত্যন্ত ভীত ও সন্ত্রস্ত থেকো। কারণ তিনি অতি পবিত্র এবং আত্মমর্যাদাভিমানী। পাপাচারী কখনও খোদার নৈকট্য লাভ করতে পারে না। অহংকারী কখনও খোদার নৈকট্য লাভ করতে পারে না। যারা কুকুর, পিপীলিকা বা শকুনের মত সংসারাসক্ত এবং সংসার-সম্ভোগে নিমগ্ন তারা কখনও তাঁর নৈকট্য লাভ করতে পারে না। প্রত্যেক অপবিত্র চক্ষু তা থেকে দূরে।

প্রত্যেক পাপাসক্ত মন তাঁর সম্বন্ধে অজ্ঞ। যে ব্যক্তি তাঁর জন্য অগ্নিতে নিপতিত, তাকে অগ্নি হতে মুক্তি দেয়া হবে। যে ব্যক্তি তাঁর জন্য কাঁদে, সে অবশ্যই হাসিবে। যে ব্যক্তি তাঁর উদ্দেশ্যে সংসারের মায়া মোহকে বর্জন করে, সে নিশ্চয় তাঁকে লাভ করবে। তোমরা আন্তরিকতাপূর্ণ সরলতা এবং উৎসাহের সাথে তাঁর বন্ধুত্ব লাভ করতে অগ্রসর হও, তাহলে তিনিও তোমাদের বন্ধু হবেন। তোমরা নিজ অধীন ব্যক্তিদের প্রতি, তোমাদের স্ত্রী-পরিজন এবং গরীব ভাইদের প্রতি দয়া কর যেন আকাশে তিনিও তোমাদের উপর দয়া করেন। তোমরা যথার্থই তাঁর হয়ে যাও যেন তিনিও তোমাদের হয়ে যান। জগৎ বহু বিপদের স্থান। অতএব, তোমরা একনিষ্ঠতার সাথে আল্লাহর দিকে ধাবমান হও যেন তিনি এই বিপদরাশি হতে তোমাদেরকে দূরে রাখেন। জগতে কোন বিপদ দেখা দেয় না, যে পর্যন্ত আকাশে তদ্বিষয়ে সিদ্ধান্ত না হয় এবং কোন বিপদ জগৎ হতে দূর হয় না, যে পর্যন্ত আকাশ হতে তাঁর দয়া বর্ষণ না হয়। সুতরাং তোমাদের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় এটাই যে, তোমরা শাখাকে অবলম্বন না করে মূলকে ধর। তোমাদের জন্য ঔষধ এবং উপকরণের ব্যবহার নিষিদ্ধ নয়। কিন্তু এদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ। কারণ পরিশেষে অবশ্য তা-ই ঘটবে, যা তিনি ইচ্ছা করেন। যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রতি নির্ভরের শক্তি রাখে তবে তদ্রুপ নির্ভরতার স্থান সর্বোচ্চ, সন্দেহ নেই।

(কিশ্‌তিয়ে নূহ্ পুস্তকের ২৩-২৫ পৃষ্ঠা)

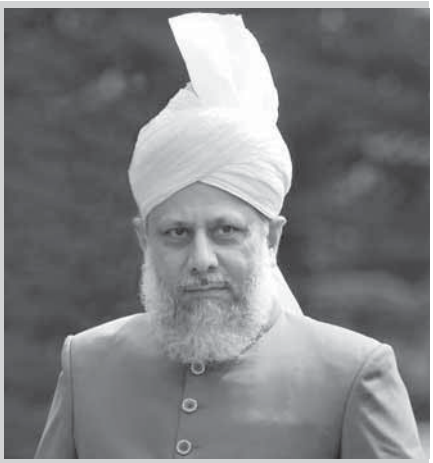

জুমুআর খুতবা

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক কানাডার মিসিসাগাস্থ ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার-এ প্রদত্ত ৬ জুলাই ২০১২-এর (৬ ওফা, ১৩৯১ হিজরী শামসি) জুমুআর খুতবা।

বেহেশ্‌তের বাগানে বিচরণ করার উপায়

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

বাংলা ডেস্ক নিজ দায়িত্বে খুতবার এই বঙ্গানুবাদ উপস্থাপন করছে।

যতক্ষণ হৃদয় বিনয়াবনত সিজদা না করবে কেবল বাহ্যিক সিজদার ভরসায় বসে থাকা দূরাশা মাত্র।

কুরবানীর রক্ত ও মাংস যেভাবে আল্লাহ্ তা'লার কাছে পৌঁছে না শুধু তাক্বওয়া পৌঁছে ঠিক একইভাবে অন্তরের রুকূ, সিজদা ও কিয়াম না হলে দৈহিক রুকূ-সিজদার কোন মূল্য নেই।

অন্তরের কিয়াম অর্থ তাঁর নির্দেশ মেনে চলা, রুকূর অর্থ তাঁর প্রতি বিনত হওয়া এবং সিজদার অর্থ তাঁর জন্য নিজ সত্তাকে তুচ্ছ জ্ঞান করা।

আলহামদুলিল্লাহ্ আজ আহমদীয়া মুসলিম জামাত, কানাডার বার্ষিক জলসা আরম্ভ হচ্ছে। একজন আহমদীর জন্য জলসা প্রভূত কল্যাণ বয়ে আনে বা আনা উচিত। কারণ একটি বিশেষ পরিবেশে কেবল ধর্মীয় উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌র স্মরণে সমবেত হওয়া আর তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে একত্রিত হওয়া আল্লাহ্‌র কৃপাবারিকে আকর্ষণ করে। মহানবী (সা.) অত্যন্ত স্পষ্ট ভাবে বলেছেন, **'আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত সভা বা বৈঠক আল্লাহ্‌র কৃপার উত্তরাধিকারী করে, জান্নাতের পথে নিয়ে যায়'**। মহানবী (সা.) বলেছেন, **'হে লোক সকল! তোমরা জান্নাতের উদ্যানে বিচরণ করতে চেষ্টা কর। সাহাবা জিজ্ঞাসা করেছেন জান্নাতের বাগান বলতে কি বোঝায়? হুযূর (সা.) বলেন, আল্লাহ্‌র স্মরণের নিমিত্তে অনুষ্ঠিত সভা বা আসরই জান্নাতের বাগান'**।

অতএব এমন সব সভা বা বৈঠক যেখান থেকে জান্নাতের রাস্তা বের হয় সেসব সভা-সমাবেশ অবশ্যই কল্যাণময় হয়ে থাকে এবং আমাদের জলসা সমূহের উদ্দেশ্যই হল, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির অর্জনের জন্য আল্লাহ্‌র ভালবাসায় এগিয়ে যাবার কথা শোনা, দোয়া ও ইবাদতের প্রতি মনোযোগী হওয়া এবং তা অর্জনের রীতি শেখা। অনুরূপভাবে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য মানবাধিকার প্রদানে সচেষ্ট হওয়া আর অন্যান্য পুণ্যকর্মের প্রতি দৃষ্টি দেয়া। আর এসব পুণ্য কর্মের প্রতি মনোযোগ, পাওনা প্রদানের প্রতি মনোযোগ– আমাদেরকে আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞ বান্দার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে আর আমাদের জিহ্বাকে তাঁর স্মরণে সিক্ত রেখে জান্নাতের উদ্যানের পথ নির্দেশ করে। বরং যার অধিকার প্রদান করা হচ্ছে সে যখন দেখবে খোদার স্মরণের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত সেই সভার কারণে অধিকার প্রদানের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ হচ্ছে তখন সেও আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা স্বীকার করবে। আর মু'মিনদের সভা-সমাবেশ এবং পারস্পরিক সম্পর্ক ও আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা স্বীকারের চিত্র ও অভিব্যক্তি এমনটিই হওয়া উচিত।

অতএব আমাদের মধ্য হতে যারা এমন মনোভাব নিয়ে এখানে আসেন এবং তদনুসারে কাজও করেন– তারা সৌভাগ্যবান। এর ফলশ্রুতিতে তারা কেবল নিজেদের জন্যই জান্নাতের বাগানের পথ সুগম করে না বরং মানবাধিকার প্রদানের মাধ্যমে অন্যদেরকেও জান্নাতের উদ্যানে বিচরণের সুযোগ করে দেয়। এভাবে অধিক কল্যাণের দ্বার উম্মোচিত হয় এবং একজন মু'মিন আল্লাহ্‌র কৃপাভাজন হয়। কারণ অন্যদেরকে পুণ্যের পথ প্রদর্শন করে অথবা অন্যের সাথে সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতার প্রেরণা সৃষ্টিকারী

অনুরূপ পুরষ্কারের ভাগী হয় যতটা সৎকর্মশীল ব্যক্তি স্বয়ং লাভ করে থাকে। এক কথায় একটি পুণ্যকর্ম সুফলের আদলে কয়েকগুণ পুরষ্কারের অধিকারী বানিয়ে দেয় এবং এভাবে আল্লাহ্‌র দয়া ও কৃপাভাজন করে।

অতএব ইনি আমাদের প্রিয় খোদা! যিনি পুণ্যকর্মের শতগুণ বরং সহস্রগুণ ফল প্রদান করেন এবং নিজ বান্দার সামান্য প্রচেষ্টাকে এতটা ফলপ্রদ করেন যা মানুষের কল্পনাতীত। কাজেই প্রিয় এই খোদার ভালবাসার সন্ধানে সবাইকে থাকা উচিত। আমি প্রায় বলে থাকি, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) জলসার সূচনা করে আমাদের জন্য আল্লাহ্‌র রহমতের দ্বার খুলেছেন। এবং জান্নাতের বাগানে বিচরণের জন্য এক সুবিস্তর ও উত্তম ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

অতএব আমাদের মধ্যে থেকে তারাই সৌভাগ্যবান যারা এমন সমাবেশ ও এমন পরিবেশ থেকে উপকৃত হয়ে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভ করবে। কাজেই এই সন্তুষ্টি লাভের জন্য এ জলসায় অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক নর-নারী, ও আবালবৃদ্ধবনিতার চেষ্টা করা উচিত। জামাতের সদস্যদেরকে এ মর্যাদার অধিকারী হিসেবে তৈরী করার জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হৃদয়ে কতটা ব্যথা ছিল এবং তিনি কত যে ব্যাকুলতার সাথে এ জন্য দোয়া করতেন তা তাঁর এ বাক্যগুলো থেকে অনুমেয়;

হুযূর (আ.) বলেন, আমি দোয়া করি এবং জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত এ দোয়া করতে থাকব যে, হে আল্লাহ্! তুমি আমার এ জামাতের সদস্যদের মন পবিত্র করে দাও এবং তোমার দয়ার হাত সুপ্রসারিত করে তাদের হৃদয়গুলোকে তোমার প্রতি আকৃষ্ট কর আর তাদের হৃদয় থেকে সর্ব প্রকার দুস্কৃতি ও হিংসা-দ্বেষ দূর করে দাও। তাদের পরস্পরের মাঝে সত্যিকার ভালবাসা সৃষ্টি করে দাও। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, কোন এক সময় এ দোয়া কবুল হবে এবং আমার দোয়াগুলো আল্লাহ্ নষ্ট করবেন না। তবে হ্যাঁ! আমি এ দোয়াও করি, আমার জামাতের কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহ্ তা'লার জ্ঞান ও ইচ্ছা অনুযায়ী চির দুর্ভাগা হয়ে থাকে, যার জন্য সত্যিকার পবিত্রতা ও খোদাভীতি অর্জন নির্ধারিত না থাকে তবে হে সর্বশক্তিমান খোদা! আমা হতে তাকে সেভাবেই বিমুখ কর যেভাবে সে তোমা হতে বিমুখ এবং তার জায়গায় তুমি অন্য কাউকে দাও যার হৃদয় কোমল এবং যার হৃদয়ে তোমার সন্ধান থাকবে'।

অতএব এ বাক্যাবলী তাঁর মর্মবেদনার এমন বহিঃপ্রকাশ যা হৃদয়কে কাঁপিয়ে তুলে, গাঁ শিউরে উঠে আর তওবা ও ইস্তেগফারের প্রতি আকৃষ্ট করে। বিশুদ্ধ হৃদয়ে আল্লাহ্ তা'লার দরবারে অবনত হয়ে, আল্লাহ্ তা'লার কাছে মাগফিরাত ও ক্ষমা প্রার্থনা করার প্রেরণা যোগায় এবং বান্দার অধিকার প্রদানের প্রতি মনোযোগী করে। কাজেই আমাদের প্রত্যেককে এ দিনগুলোতে তওবা, ইস্তেগফার, দরূদ ও যিক্‌রে ইলাহীর প্রতি মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন। আল্লাহ্ তা'লা যেন শুধু আমাদের ঈমানকেই নিরাপদ না রাখেন বরং ঈমান, বিশ্বাস ও তাক্বওয়ার ক্ষেত্রে ক্রমোন্নতি প্রদান করা অব্যাহত রাখেন। আমাদের ইস্তেগফার যেন খাঁটি ইস্তেগফার হয়। আমাদের নামায ও ইবাদত যেন খাঁটি নামায ও ইবাদতে পরিণত হয় এবং আমাদের পক্ষ থেকে বান্দার প্রাপ্য অধিকার সংরক্ষণ করা যেন সত্যিকার অর্থেই আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের জন্য হয়।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এই উপদেশটিও দৃষ্টিপটে রাখতে হবে- তিনি (আ.) বলেন, **'যতক্ষণ হৃদয় বিনয়াবনত সিজদা না করবে কেবল বাহ্যিক সিজদার ভরসায় বসে থাকা দূরাশা মাত্র'**। অর্থাৎ আমরা খুব সিজদা করছি আর আল্লাহ্ তা'লা আমাদের দোয়া কবুল করবেন এসবই মিছে আশা। তিনি (আ.) বলেন, **'কুরবানীর রক্ত ও মাংস যেভাবে আল্লাহ্ তা'লার কাছে পৌঁছে না শুধু তাক্বওয়া পৌঁছে ঠিক একইভাবে অন্তরের রুকূ, সিজদা ও কিয়াম না হলে দৈহিক রুকূ-সিজদার কোন মূল্য নেই'**। তিনি (আ.) বলেন, **'অন্তরের কিয়াম অর্থ' তাঁর নির্দেশ মেনে চলা, রুকূর অর্থ তাঁর প্রতি বিনত হওয়া এবং সিজদার অর্থ তাঁর জন্য নিজ সত্তাকে তুচ্ছ জ্ঞান করা'**। অতএব এটি হল তাঁর মান্যকারী ও জামাতের প্রতি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রত্যাশা। তিনি (আ.) চান, তাক্বওয়ার মান যেন অর্জিত হয় আর এজন্য তিনি অত্যন্ত ব্যথাতুর হৃদয়ে এ দোয়া করেছেন। আল্লাহ্ করুন, আমরা যেন এ মর্যাদার অধিকারী হতে পারি। জাগতিক কাজে আমাদের অনেক বেশি ব্যস্ত হয়ে যাওয়ায় এবং তাক্বওয়া থেকে দূরে চলে যাওয়ায় আমরা যেন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বৈপ্লবিক মিশনে বাধা সৃষ্টিকারী না হই। আমরা যেন আল্লাহ্ ও বান্দার অধিকারকে পদদলিত না করি। আমরা যেন তাঁর {মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আত্মার কষ্টের কারণ না হই।

অতএব এ জলসার কল্যাণ হতে পূর্ণভাবে লাভবান হতে এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আকাড়খা ও দোয়ার উত্তরাধিকারী হবার জন্য প্রত্যেক আহমদীকে নতুন উদ্দ্যমে অঙ্গীকার করতে হবে ও সচেষ্ট হতে হবে। (আর এ অঙ্গীকার হল), আমরা আমাদের তাক্বওয়ার মান আরো উন্নত করতে প্রয়াসী হব। তাক্বওয়ার পথ অনুসন্ধানের যে শিক্ষা পবিত্র কুরআন আমাদেরকে দিয়েছে এবং প্রকৃত মু'মিনের যে মান উল্লেখ করেছে তা খুঁজে বের করে এর উপর আমল করার পরই, আমরা তাক্বওয়ার সেই মান অর্জন করতে পারবো যার প্রত্যাশ্যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের কাছে ব্যক্ত করেছেন।

তাক্বওয়ার পথ অনুসরণের বিষয়টি, পবিত্র কুরআনের অনেক স্থানে বিভিন্ন আঙ্গিকে বর্ণিত হয়েছে। আমি কয়েকটি (আয়াতের) উল্লেখ এখানে করব যাতে করে আত্মবিশ্লেষণের প্রতি আমাদের প্রত্যেকের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ অর্থাৎ আমি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তাই তোমরা আমাকেই ভয় কর (সূরা আন্ নাহ্‌লঃ ৩)। তাক্বওয়ার অর্থ হল, আত্মরক্ষার জন্য ঢাল এর পিছনে আশ্রয় নেয়া। পাপ থেকে আত্মরক্ষার উপায় খুঁজে বের করা। আল্লাহ্ বলছেন, যথাযথভাবে আমার ইবাদত করাই হল তাক্বওয়া। আর এ তাক্বওয়া প্রত্যেক উপায়ে তোমাদের রক্ষা করবে, পাপ থেকে রক্ষা করবে এবং বিপদ থেকে মুক্ত করবে। এটি সুস্পষ্ট, আল্লাহ্ তা'লার যথাযথভাবে ইবাদত করাই সেই মার্গে পৌছায় যেখানে খোদার ভয়-ভীতির সৃষ্টি

হয়। তবে এ ভয়-ভীতি খোদা তা'লার প্রতি ভালবাসার কারণে, একজন প্রকৃত ইবাদতকারী ও মু'মিনের হৃদয়ে সৃষ্টি হয়। অন্য ভাষায় একেই তাক্বওয়া বলা হয়। তাক্বওয়ার পথে পরিচালিত ও খোদা তা'লার সন্তুষ্টিপ্রাপ্ত গণ্য হবার জন্য প্রত্যেক আহমদীকে ইবাদতের দায়িত্ব পূর্ণভাবে পালন করার প্রতি যত্নবান হতে হবে। আর এটিই হল, মানব সৃষ্টির মূল উদ্দ্যেশ্য। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ অর্থাৎ আমি জিন ও ইনসানকে কেবল আমার ইবাদতের উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছি (সূরা যারিয়াত: ৫৭)।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, 'বিভিন্ন প্রবৃত্তির মানুষ নির্বুদ্ধিতা ও হীনমন্যতার কারণে নানাবিধ লক্ষ্যকে নিজেদের জীবনের উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে।' (হুযুর ব্যাখ্যা করে বলেন), আমরা আজকাল লক্ষ্য করছি বরং সর্বদাই এই নীতি চলমান যে, মানুষ মনে করে তার জীবনের উদ্দেশ্য সে নিজেই নির্ধারণ করে অথবা মনে করে তার জীবনের উদ্দেশ্য যেহেতু সে নিজেই নির্ধারণ করেছে তাই এটিই হল তার সফলতার রহস্য। আর এভাবে মানুষ খোদা তা'লা কতৃক বর্ণিত মানব জীবনের আসল উদ্দেশ্য ভুলে যায়। হীনমন্যতার কারণে জীবনের ভিন্ন লক্ষ্য নির্ধারণ করে। আর তা জাগতিক চাওয়া-পাওয়া পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু খোদা তা'লা (মানব সৃষ্টির) যে উদ্দেশ্য নিজ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন তা হল,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُو অর্থাৎ আমি জিন ও ইনসানকে আমাকে চিনতে এবং আমার উপাসনার জন্য সৃষ্টি করেছি। অতএব এ আয়াতের আলোকে মানব সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য হল, খোদা তা'লার ইবাদত করা, তাঁর সাথে পরিচিত হওয়া এবং তাঁর মধ্যে বিলীন হয়ে যাওয়া। এ কথা সুস্পষ্ট, নিজের জীবনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য নির্ধারণ করা মানুষের নিজের নিয়ন্ত্রণে নেই। কেননা মানুষ নিজের ইচ্ছায় আসেও না আর নিজের ইচ্ছায় যাবেও না বরং সে তো সৃষ্ট। যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন এবং সব প্রাণীকূলের তুলনায় তাকে সর্বোত্তম গুণাবলীতে ভূষিত করেছেন। আর তিনি তার জীবনের একটা উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে রেখেছেন। কোন মানুষ এই উদ্দেশ্য অনুধাবন করুক বা না করুক মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য নিঃসন্দেহে খোদা তা'লার ইবাদত করা এবং খোদাকে চিনা ও খোদা তা'লাতে বিলীন হয়ে যাওয়া।

অতএব এটি সেই মর্যাদা ও মানদন্ড যা প্রত্যেক আহমদীকে অর্জন করা উচিত। এজন্য চেষ্টা-প্রচেষ্টা আবশ্যক। মানুষ যতই নিজের উদ্দেশ্য নির্ধারণ করুক না কেন আর তা অর্জনের যত চেষ্টাই করুক, তার জীবন নিরর্থক হবে। বর্তমানে পৃথিবীতে বিশেষ করে পশ্চিমা বিশ্বে নিজের আরাম-আয়েশের জন্য নিজের উদ্দেশ্যাবলী চরিতার্থ করার জন্য মানুষ বিভিন্ন পদ্ধতি আবিষ্কারের চেষ্টা করছে যার সারকথা হল, নির্লজ্জতা। মানবীয় মূল্যবোধ এতই অধঃপতিত হয়েছে যে, সকল প্রকার নগ্নতা ও বাজে কার্যকলাপ মানুষের সামনে করা হচ্ছে এমনকি টিভিতে প্রদর্শনকে দোষণীয় মনে করা হয় না। বরং অনেক কাজ পশুর চেয়েও ঘৃণ্য হয়ে থাকে। এর নাম রাখা হয় বিনোদন ও প্রশান্তি।

মানুষ যতই নিজের উদ্দেশ্য নির্ধারণ করুক না কেন আর তা অর্জনের যত চেষ্টাই করুক, তার জীবন নিরর্থক হবে। বর্তমানে পৃথিবীতে বিশেষ করে পশ্চিমা বিশ্বে নিজের আরাম-আয়েশের জন্য নিজের উদ্দেশ্যাবলী চরিতার্থ করার জন্য মানুষ বিভিন্ন পদ্ধতি আবিষ্কারের চেষ্টা করছে যার সারকথা হল, নির্লজ্জতা। মানবীয় মূল্যবোধ এতই অধঃপতিত হয়েছে যে, সকল প্রকার নগ্নতা ও বাজে কার্যকলাপ মানুষের সামনে করা হচ্ছে এমনকি টিভিতে প্রদর্শনকে দোষণীয় মনে করা হয় না। বরং অনেক কাজ পশুর চেয়েও ঘৃণ্য হয়ে থাকে। এর নাম রাখা হয় বিনোদন ও প্রশান্তি।

এদের অবস্থার চিত্রই আল্লাহ্ তা'লা এভাবে অঙ্কন করেছেন। বলেছেন,

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ

(সূরা আল্ আ'রাফ: ১৮০) অর্থাৎ নিশ্চয় আমরা মানুষ ও জিনদের এক বড় অংশকে জাহান্নামের জন্য প্রস্তুত করেছি। তাদের হৃদয় আছে কিন্তু এর মাধ্যমে তারা উপলব্ধি করে না অর্থাৎ আধ্যাত্মিকতাকে বোঝার যোগ্যতাই তারা রাখে না। তাদের চোখ রয়েছে কিন্তু এর মাধ্যমে তারা দেখে না। তাদের কান আছে কিন্তু এর মাধ্যমে তারা শুনে না। তাদের হৃদয়ে আধ্যাত্মিকতাও নেই, আর না তাদের কান আধ্যাত্মিকতার কথা ও ধর্মের কথা শুনার উপযুক্ত আর না তারা অন্যের জিনিস ও সে বিষয় দেখার প্রতি মনোযোগ দেয়, যা দেখার জন্য খোদা তা'লা বলেছেন, আর না তা দেখা থেকে বিরত থাকে যা দেখতে খোদা তা'লা বারণ করেছেন। মোটকথা জাগতিক কামনা-বাসনা সম্পূর্ণরূপে তাদের উপর ছেয়ে গেছে। তিনি বলেছেন, এই লোকেরা চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় বরং এর চেয়েও অধম ও বিভ্রান্ত আর এরাই উদাসীন।

আবার অন্য এক স্থানে আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ

(সূরা আল্ ফুর্কান: ৪৪) অর্থাৎ তুমি কি সেই ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য করেছ, যে নিজেদের কামনা-বাসনাকে তার উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে? এরা কেবলমাত্র তাদের কামনা-বাসনারই পূজারী।

আবার বলছেন,

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا

(সূরা আল্ ফুর্কান: ৪৫) অর্থাৎ তুমি কি মনে কর, তাদের মাঝে অধিকাংশ শুনে বা বুদ্ধি বিবেক রাখে। তাদের মাঝে অধিকাংশই চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় বরং আরো অধম। এ আয়াতে তাদের অঙ্কন করা হয়েছে যারা নিজেদের সৃষ্টির

উদ্দেশ্যকে বুঝে না। আর নিজেদের কামনা-বাসনার পিছনে ছুটে চলেছে। যেভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, যিনি সৃষ্টি করে, সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে নির্ধারণ করেছেন তোমরা তাঁকে ভুলে গেছ। আর নিজেদের লক্ষ্য নিজেরা নির্ধারণ করছ। এমন লোকদের ঠিকানা হলো জাহান্নাম। জন্তু-জানোয়ারের কর্মের হিসাব হবে না। কিন্তু এই অধঃপতিতদের কর্মের যে হিসাব হবে তা তাদেরকে অবশ্যই জাহান্নামে নিয়ে যাবে। এখানে ঐ বিষয়টি স্পষ্ট, আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন আমরা এক বড় অংশকে জাহান্নামের জন্য প্রস্থত করেছি।

কিন্তু এর দ্বারা ভুল বোঝা-বুঝির যেন সৃষ্টি না হয় যে আল্লাহ্ তা'লার কথায় স্ববিরোধ আছে, এক দিকে বলছে, আমি জিন ও ইনসানকে আমার ইবাদতের উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছি আবার অন্যদিকে বলছে, জাহান্নামের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছি! বরং এর অর্থ হল, খোদা তা'লার পক্ষ থেকে পথ প্রদর্শন সত্ত্বেও, খোদা তা'লার কৃপা অফুরন্ত হওয়া সত্ত্বেও অধিকাংশ লোক একে কাজে লাগায় না এবং খোদা তা'লার ইবাদত করে নিজের ইহকাল-পরকালকে সুন্দর করে না করে এর পরিবর্তে স্বীয় কামনা-বাসনার দাসত্ব করে জাহান্নামের পথ সুগম করে। ভাষাবিদগণ বিষয়টিকে এভাবেও ব্যাখ্যা করেছেন, জাহান্নাম শব্দের পূর্বে 'লে' ব্যবহার করা হয়েছে বা যে অতিরিক্ত লাম যুক্ত করা হয়েছে তা তাদের পরিণামের দিকে ইঙ্গিত করে– তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্যের দিকে নয়। অতএব মানুষ খোদা তা'লার সাথে দূরত্ব সৃষ্টি করে, তার ইবাদতের দায়িত্ব পালন না করে, আদেশ-নিষেধ না মেনে মন্দ পরিণামের সম্মুখীন হচ্ছে। আমি যেভাবে বলেছি, বর্তমানে মানুষের অপকর্মের কারণে এমন পরিণাম হয়েছে। পশুর চেয়েও নীচ কার্যকলাপ আরম্ভ করেছে, প্রকাশ্যে নোংরা কর্মে লিপ্ত। মন্দ এবং অশ্লীল কাজ করা হয়। পর্ণোগ্রাফির ভিডিও এবং ফিল্ম সহজেই হস্তগত করা যায়। এগুলো দেখে এরা পশুর চেয়েও অধম হয়ে গেছে। আক্ষেপের সাথে বলতে হয়, আমার কাছে অনেক এমন অভিযোগও আসে, আমাদের আহমদী যুবকরা বরং মধ্য বয়স্ক অনেকে এমন নোংরা ছবি বা তুলনামূলক ভাবে কম নোংরা ছবি দেখার ব্যাধিতে আক্রান্ত যার ফলে কতিপয় ঘরও ভেঙে যাচ্ছে।

তাই প্রত্যেককে খোদা তা'লাকে ভয় করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন, এমন বিপথগামী লোকদের ঠিকানা হল জাহান্নাম। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-ও স্পষ্ট করে বলেছেন, **'যদি আমার সাথে থাকতে হয় তবে এসব বৃথা কার্যকলাপ ও কামনা-বাসনার দাসত্ব পরিত্যাগ কর, অন্যথায় আমার থেকে পৃথক হয়ে যাও'।** এমন লোকেরা সাধারণত জলসা ইত্যাদিতে আসে না, জামাত থেকেও দূরে সরে থাকে। কিন্তু আমার এ কথা যদি তাদের কর্ণগোচর হয় অথবা তাদের আত্মীয়-স্বজন যদি তাদেরকে এ কথাগুলো পৌঁছে দেন তাহলে তাদের আত্ম-সংশোধনের চেষ্টা করা উচিত। অথবা নিযামে জামাত কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করার পূর্বে তারা স্বয়ং জামাত থেকে পৃথক হয়ে যাক। একইভাবে যৌবনে যারা পদার্পণ করছে তারা ভাল-মন্দ উপলব্ধি করে না আর পরিবারের সদস্যরাও তাদেরকে বোঝায় না। নিযাম বা জামাতের ব্যবস্থাপনার সাথেও তাদের এতটা সম্পৃক্ততা থাকে না। কাজেই তাদেরকেও আমি বলব, এ ধরনের কুরুচিপূর্ণ জিনিস দেখা, ফিল্ম ইত্যাদি দেখা এক ধরনের নেশা। তাই এমন লোকদের সাথে বন্ধুত্ব করবে না যারা এই বৃথা কাজে লিপ্ত। কেননা তারা তোমার উপরও প্রভাব বিস্তার করবে। একবারও যদি এ ধরনের বা কোন ধরনের নোংরামীর শিকার হও তাহলে এথেকে পরিত্রাণ পাওয়া মুশকিল হয়ে যাবে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) উক্ত আয়াতগুলোর ব্যাখা করতে গিয়ে একস্থলে বলেন, 'খোদা তা'লা বলেছেন, আমরা জাহান্নামের জন্য অধিকাংশ মানবজাতিকে এবং জিনকে সৃষ্টি করেছি। আরও বলেন, সে জাহান্নাম তারা স্বয়ং বানিয়ে নিয়েছে'। আল্লাহ্ তা'লা ঐ জাহান্নাম সৃষ্টি করেন নি বরং জাহান্নাম তারা স্বয়ং প্রস্থত করেছে। তিনি (আ.) বলেন, 'তাদেরকে জান্নাতের দিকে আহ্বান করা হয়, পবিত্র হৃদয় পবিত্রতার কথা শ্রবণ করে এবং অপবিত্রচেতা মানুষ তার কলুষিত মস্তিষ্ক নিয়ে কাজ করে। তাদেরকে জান্নাতের দিকে আহ্বান করা হয় কিন্তু তারা শ্রবণ করে না'। যারা পবিত্র হৃদয়ের অধিকারী তাদের উপর পবিত্র কথার প্রভাব পড়ে। কিন্তু যারা নিজেদের বুদ্ধিমান মনে করে, তারা বলে, জগতের আলোকে ভোগ করা উচিত, তারা নিজেদের বুদ্ধির উপর নির্ভর করে, তাদের পরিণাম জাহান্নাম হয়ে থাকে। তিনি (আ.) বলেন, 'এমন লোকদের জন্য পরকালেও জাহান্নাম আর ইহকালেও'।

অর্থাৎ ইহলৌকিক জাহান্নাম থেকেও মুক্তি মিলবে না। কেননা পার্থিব জাহান্নাম পরকালীন জাহান্নামের লক্ষণ ও প্রমাণ স্বরূপ হয়ে থাকে। এরূপ লোকদের কোন কোন ব্যাধি এবং অন্যান্য কারণে এ পৃথিবীতেও জাহান্নাম দৃষ্টি গোচর হয়। এরপর পার্থিব জাহান্নামের চিত্র অঙ্কন করে তিনি (আ.) বলেন, 'এ ধারণা কর না যে, কোন বাহ্যিক দৌলত বা রাজত্ব বা সম্পদ ও সম্মান, অধিক সন্তান-সন্ততি কোন ব্যক্তির জন্য আরাম বা প্রশান্তি ও আনন্দের কারণ হয় আর সে সময় সে বেহেশ্‌তে থাকে। কখনো নয়, সেই প্রশান্তি, সুখ ও আনন্দ যা বেহেশ্‌তের পুরস্কারাদীর অন্তর্ভূক্ত তা এসব কথার ফলে লাভ হয় না। বরং তা খোদার সত্তার জন্য জীবন-যাপন ও মৃত্যু বরণ করার মাধ্যমেই লাভ হয়'।

তিনি (আ.) বলেন, 'পার্থিব মোহ এক ধরনের অপবিত্র লোভ সৃষ্টি করে, চাহিদা ও পিপাসা বাড়িয়ে দেয়। (ইসতেস্‌কা) অধিক পিপাসায় ভোগে এমন রোগীদের ন্যায় ধ্বংস হওয়া ছাড়া কখনো তাদের তৃষ্ণা নিবারণ হয় না। অতএব এসব বৃথা আকাড়খা ও আক্ষেপের আগুনও মূলতঃ সেই জাহান্নামের আগুন যা মানুষের হৃদয়কে শান্তি ও মুক্তি পেতে দেয় না বরং তাকে এক অনিশ্চয়তা ও ব্যাকুলতায় জর্জরিত করে রাখে। তাই এ বিষয়টি কখনো যেন আমার বন্ধুদের দৃষ্টির আড়ালে না থাকে'। অর্থাৎ তাঁর এ কথাগুলো সর্বদা স্মরণ রাখুন। এ আগুন মানব হৃদয়কে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেয় এবং একটি পোড়া কয়লার চেয়েও কালো অন্ধকারাচ্ছন্ন বানিয়ে দেয়। এটি হচ্ছে আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে অন্যকে ভালবাসার পরিণাম।

অতএব একজন প্রকৃত মু'মিনকে তাক্বওয়ার পথে বিচরণকারী এবং

তাক্বওয়া সন্ধানীকে নিজের সব কর্ম বিশুদ্ধভাবে কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য সম্পাদন করতে হবে। হৃদয় থেকে কামনা-বাসনা এবং কৃত্রিম প্রশান্তির পার্থিব প্রতিমা সমূহ বের করে বাইরে নিক্ষেপ করতে হবে। তবেই একজন বিশ্বাসী প্রকৃত বিশ্বাসী হতে পারবে। অতএব এ দিনগুলোতে আল্লাহ্ তা'লা সংশোধনের যে সুযোগ দান করেছেন, সবার উচিত আত্মসংশোধনের প্রতি মনোযোগ দেয়া। শুধু বড়-বড় পাপই নয় বরং ছোট-খাটো পাপও দূর করার চেষ্টা করা একান্ত প্রয়োজন। কেননা এসব ছোট-ছোট পাপ কখনো কখনো মানুষকে তাক্বওয়া থেকে দূরে নিয়ে যায় এবং ক্রমশঃ পাপে নিমজ্জিত করতে থাকে। সর্বদা খোদার স্মরণে রত থাকুন। ইস্তেগফার ও দরূদের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য অর্জনের চেষ্টা করুন। আপন হৃদয়কে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যান্য বস্তুর ভালবাসা থেকে মুক্ত করুন। আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞ বান্দা হোন কেননা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ খোদা তা'লার ভালবাসা আকর্ষণ করার মাধ্যম হয়ে থাকে। এ দেশে এসে পার্থিব দিক থেকে আল্লাহ্ তা'লার কৃপা সমূহের যে দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে তাকে খোদা তা'লার অসন্তুষ্টির মাধ্যম নয় বরং তাঁর পুরস্কাররাজি অর্জনের মাধ্যম বানান। আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, তোমাদের তাক্বওয়া তোমাদের মর্যাদার কারণ। এটি বলেন নি যে, তোমাদের অর্থ-সম্পদ তোমাদের মর্যাদার কারণ।

আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন,

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ অর্থাৎ নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি সে যে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক মুত্তাকী বা খোদাভীরু (সূরা আল্ হুজুরাত: ১৪)। আমরা প্রায়ই এটি শুনে থাকি, প্রায়ই আমাদের বক্তৃতা সমূহে বক্তারা এটি উল্লেখ্য করে থাকেন, কিন্তু এটি যেভাবে পালন হওয়া প্রয়োজন সেভাবে হয় না। যদি এটি সত্যিকারভাবে পালিত হয় তবে অনেক বিষয়, অনেক ঝগড়া-বিবাদ যা জামাতের অভ্যন্তরে সৃষ্টি হয়ে থাকে তা আপনা-আপনি সমাধান হয়ে যাবে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ - অনুসারে কোন ব্যক্তি যত বেশী তাক্বওয়ার সুক্ষ্ম পথ অনুসরণ করবে, খোদা তা'লার সন্নিধানে সে ততই মর্যাদার অধিকারী হবে'।

কাজেই বিপদ আসার পূর্বে বিপদ থেকে নিরাপদ থাকার আগাম চেষ্টা করা অর্থাৎ বিপদ আসার পূর্বেই বিপদ থেকে বাঁচার পন্থা অবলম্বন করা নিঃসন্দেহে উচ্চ মার্গের তাক্বওয়া। এরপর তিনি (আ.) বলেন, 'মহান ও সম্মানিত কেউ কখনো পার্থিব নীতির ভিত্তিতে হতে পারে না বরং খোদার দৃষ্টিতে সে-ই মহান যে মুত্তাকী'। তিনি (আ.) আরো বলেন, 'স্ব-ধর্মের গরীব ভাইদের প্রতিও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করবে না, ধন-সম্পদ অথবা বংশগত গৌরব নিয়ে অনর্থক বড়াই করে অন্যদের তুচ্ছ ও ছোট মনে করবে না। খোদার দৃষ্টিতে সে-ই সম্মানিত যে মুত্তাকী'। এরপর তিনি (আ.) আরো বলেন, 'মুক্তি বংশগত শ্রেষ্ঠত্ব বা ধন-সম্পদের উপর নির্ভর করে না বরং এটি আল্লাহ্ তা'লার করুণার (কর্ম) উপর নির্ভর করে আর আল্লাহ্ তা'লার কর্ম বা করুণা কীভাবে অর্জন করা যায়'। এ ব্যাপারে তিনি (আ.) বলেন, 'সৎকর্ম এবং হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর পরিপূর্ণ আনুগত্য এবং দোয়াই এই খোদার কৃপাকে আকর্ষণ করে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার কর্ম বা স্নেহ আকর্ষণ করে সৎকর্ম এবং হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর সত্যিকার অনুসরণ, আনুগত্য আর দোয়া। আবার অন্যত্র তিনি (আ.) সুস্পষ্টভাবে সর্তক করেছেন আর এর বাক্যগুলোও বেশ কঠোর।

তিনি (আ.) বলেন, 'আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে মহান ও সম্মানিত সে-ই যে মুত্তাক্বী। এখন যে জামাত তাক্বওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত খোদা তা'লা সেই জামাতকেই প্রতিষ্ঠিত রাখবেন এবং অন্যদের ধ্বংস করে দিবেন। এটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর অবস্থা আর এই জায়গায় মুত্তাকী এবং পাপাচারী উভয় সহাবস্থান করতে পারে না। মুত্তাকীর টিকে থাকা এবং নোংরার ধ্বংস হয়ে যাওয়া অবধারিত। আর আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে কে মুত্তাকী এর জ্ঞান যেহেতু খোদাই রাখেন তাই এটি অত্যন্ত ভয়ের ব্যাপারে। সে ব্যক্তিই সৌভাগ্যবান যে মুত্তাকী এবং সে-ই দুর্ভাগা যে অভিস্পাতগ্রস্থ।

অতএব আমি যেসব উদ্ধৃতি পাঠ করেছি এগুলো একজন মুত্তাকী আহমদীকে আন্দোলিত করার জন্য যথেষ্ট। তিনি (আ.) বলেন, 'বিপদ আপতিত হবার পূর্বেই সেই বিপদ থেকে বাঁচার চেষ্টা কর এবং বিপদ-আপদ থেকে বাঁচা বলতে যা বুঝায় তা হল, সকল কথা ও কাজ যেন আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য হয়। যেন মুক্তিপ্রাপ্তদের তালিকাভূক্ত হওয়া যায়'। এরপর তিনি এই তালিকায় অর্ন্তভূক্ত হবার তিনটি পন্থা উল্লেখ করেছেন, প্রথমতঃ সৎকর্ম কর দ্বিতীয়তঃ তোমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ যেন পুণ্যার্জনের লক্ষ্যে হয়, অর্থাৎ সৎকর্মের দিকে ইঙ্গিত করছেন। আর এই পুণ্যকর্ম শনাক্তকরণ সম্ভব হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর আদর্শের দর্পণে। অতএব সেই আদর্শ দেখ! এটি সেখানে-ই পাবে। হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর অনন্য আদর্শ সম্পর্ক হযরত আয়শা (রা.) বলেছিলেন, 'তাঁর আদর্শ হল, পবিত্র কুরআন'। অতএব পবিত্র কুরআনের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে।

অতএব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, 'হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর পরিপূর্ণ আনুগত্য কর তাহলে তা লাভ হবে। এরপর নিজ কর্ম এবং মহনাবী (সা.)-এর সুন্নতের অনুসরণকে আল্লাহ্ তা'লার সামনে নত হয়ে দোয়ার মাধ্যমে আরো সুন্দর কর'। তিনি (আ.) বলেন, 'এই জামাতের অদৃষ্টেই সফলতা নির্ধারিত আর এরাই তাক্বওয়ার উপর পরিচালিত যারা বিশ্বে বিজয় লাভ করবে'।

কাজেই আমাদের মাঝে তারাই সৌভাগ্যবান যারা এই মূল বিষয়টি বুঝে, এই মৌলিক বিষয়টি অনুধাবন করে আর পার্থিব ধন-সম্পদকে অগ্রগণ্য মনে করে না বরং তারা খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তাক্বওয়া অর্জনের চেষ্টা করে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আহমদীদের একটি বড় অংশ এর জন্য চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও সাধনা করে। জামাতের সদস্যদের আচার-আচরণ এবং ত্যাগ তিতিক্ষার মাধ্যমে এর বহিঃপ্রকাশ ঘটে। কিন্তু এখনও এ ক্ষেত্রে অনেক উন্নতির অবকাশ আছে। খোদা তা'লা আমাদের সবাইকে এর তৌফীক দান করুন, আমরা যেন এই গুরুত্বপূর্ণ

বিষয়টি বুঝি, তাক্বওয়ার উপর পরিচালিত হয়ে আল্লাহ্ তা'লা একজন মুত্তাকী সম্পর্কে যে অঙ্গীকার করেছেন তা থেকে অংশ লাভ করতে পারি। মুত্তাকীদেরকে প্রদত্ত আল্লাহ্ তা'লার অনেক প্রতিশ্রুতির মাঝে এই অঙ্গীকারও রয়েছে,

وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ অর্থাৎ সফলতা এবং উত্তম পরিণাম মুত্তাকীদের জন্যই নির্ধারিত (সুরা আল্ আ'রাফ: ১২৯)।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, 'সর্বপ্রকার হিংসা, বিদ্বেষ, প্রতিহিংসা, পরচর্চা, আত্মম্ভরিতা, আমিত্ব ও অপকর্ম তা গোপনে হোক বা প্রকাশ্যে আর আলস্য ও ঔদাসীন্য এড়িয়ে চল। স্মরণ রেখ! শুভ পরিণাম সর্বদা মুত্তাকীদেরই হয়ে থাকে। যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (সুরা আল্ আ'রাফ: ১২৯) – কাজেই মুত্তাকী হবার জন্য চিন্তা কর।

অতএব এই যে পরিবেশ যা জলসার কল্যাণে আমাদের লাভ হচ্ছে একে পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগিয়ে আমাদের প্রত্যেককে নিজের পাপের উপর দৃষ্টি রেখে সকল প্রকার মন্দ থেকে মুক্ত থাকার জন্য চেষ্টা করতে হবে। আর সকল প্রকার সৎকর্মের প্রতি মনোযোগী হতে হবে যা আমাদেরকে সফলভাবে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির দ্বার প্রান্তে উপনীত করবে। আল্লাহ্ তা'লা কেবল ব্যক্তিগত শুভ পরিণামের কথা বলেই যথেষ্ট মনে করেন নি বরং জামাতের সদস্যদের যত বড় অংশ আন্তরিক প্রচেষ্টার সাথে সৎকর্মের অনুসরণ ও তাক্বওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার চেষ্টা করবে, সমষ্টিগতভাবে জামাতের উপর আল্লাহ্ তা'লার আশিসের বারিধারাও প্রবলতর হতে থাকবে অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার কৃপা বৃদ্ধি পেতে থাকবে। আর সেই অঙ্গীকার যা খোদা তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে করেছেন, তা নিজেদের জীবনে আমরা পুরো হতে দেখব।

নিশ্চয় এটি খোদা তা'লার অঙ্গীকার। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথেও আল্লাহ্ তা'লা একই অঙ্গীকার করেছেন যেমনটি খোদা তা'লা স্বীয় রীতি অনুযায়ী তাঁর সকল প্রত্যাদিষ্টের সাথে অঙ্গীকার করে থাকেন, كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي -অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা এটি নির্ধারিত করে রেখেছেন, আমি এবং আমার রসূলই জয়যুক্ত হব (সূরা আল্ মুজাদেলা: ২২)। অতএব প্রকৃত ইসলাম এবং আহমদীয়াতই জয়যুক্ত হবে। ইসলামের জয়যুক্ত হবারই কথা কিন্তু আমরা যদি তাক্বওয়ার ক্ষেত্রে উন্নতি করি তাহলে আমরা আমাদের জীবদ্দশাতেই ইনশাআল্লাহ্ তা'লা সেই উন্নতি এবং বিজয় প্রত্য করব। এই শুভ পরিণাম যা জামাতের জন্য অবধারিত এর মহিমা ইনশাআল্লাহ্ তা'লা আমরা স্বয়ং প্রত্য করব।

অতএব এই মাহাত্ম্যকে এবং এই বিজয়কে প্রত্য করার জন্য নিজেদের তাক্বওয়ার মানকে উন্নত করার জন্য প্রত্যেক আহমদীকে চেষ্টা করে যাওয়া উচিত। জামাতের উন্নতি এবং পরিণাম সম্পর্কে এক স্থানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, 'এটিও স্মরণ রাখার যোগ্য, সিদ্ধান্ত নির্ভর করে পরিণামের উপর, খোদা তা'লা একথাই বলেছেন, وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ । তিনি (আ.) বলেন, এটিই আল্লাহ্ তা'লার চিরন্তন রীতি, সত্যবাদীদেরকে তাদের পরিণামের মাধ্যমে শনাক্ত করা হয়'। তিনি (আ.) বলেন, সূচনাতে নবীদের উপর এমন কঠিন ভূমিকম্প আসে যে, দীর্ঘকাল পর্যন্ত সফলতার কোন চিহ্নই দেখা যায় না। কিন্তু অবশেষে ঐশী সাহায্যের প্রভাত সমীরণ প্রবাহিত হতে আরম্ভ হয়'।

নিজ জামাতের এই শুভ পরিণতি এবং ঐশী সুসংবাদের কথা তিনি (আ.) এভাবে উল্লেখ করেছেন, 'সত্য প্রতিশ্রুতি স্বরূপ খোদার পক্ষ থেকে শুভ সংবাদ লাভ করে থাকি'। অর্থাৎ আমি আল্লাহ্ তা'লার প থেকে সত্য প্রতিশ্রুতি ভিত্তিক সুসংবাদ পাচ্ছি। এর ফলে আমার দুঃখ সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত হয়ে যায় আর এ কথায় নুতনভাবে ঈমান দৃঢ় হয়। অর্থাৎ জামাতের শুভ পরিণাম সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা যখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে সংবাদ দেন তখন তিনি (আ.) বলেন, 'আমার ঈমান সতেজ হয়ে যায়'।

অতঃপর তিনি (আ.) বলেন, 'আমি সুগন্ধ পাচ্ছি, ইনশাআল্লাহ্ চূড়ান্ত বিজয় আমাদের-ই হবে'। অতএব এ উন্নতি এবং বিজয় জামাতে আহমদীয়ার অদৃষ্টেই লিপিবদ্ধ আছে। আমাদের এ উন্নতির অংশ হতে হলে আমাদের তাক্বওয়ার মানকে উন্নত করা আবশ্যক। জলসার এ দিনগুলোতে এবং কিছু দিন পর ইনশাআল্লাহ্ যে রমযান শুরু হতে যাচ্ছে, তা থেকেও পরিপূর্ণ কল্যাণ লাভ করে প্রত্যেক আহমদীকে স্বীয় তাক্বওয়ার মানকে উন্নততর করা অব্যাহত রাখতে হবে।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে তা অর্জনের সামর্থ দান করুন এবং জলসার এ দিনগুলোর কল্যাণে প্রত্যেককে সিক্ত হবার সুযোগ দান করুন। আমাদের প্রত্যেকে-ই জলসার সাথে সম্পৃক্ত সমস্ত কল্যাণ লাভে সক্ষম হোক। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) জলসায় যোগদানকারী এবং জামাতের সদস্যদের জন্য যে দোয়া করেছেন আমরা যেন সেসব দোয়ার উত্তরাধীকারী হতে পারি।

কতক প্রসাশনিক বিষয়ও রয়েছে। জলসার সমস্ত কার্যক্রম পুরো মনোযোগসহ সবার শোনা উচিত, উপস্থিতিও যথাযথ থাকা উচিত। যেসব জ্ঞানগর্ভ, আধ্যাত্মিক, শিক্ষামূলক বিষয় বর্ণীত হবে সেগুলোকে নিজেদের জীবনের অংশে পরিণত করার চেষ্টা করুন। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে সে সুযোগ দান করুন।

এছাড়া প্রসাশনিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ বিষয়ও বলতে চাই, জলসায় অংশগ্রহণকারী প্রত্যেককে ব্যবস্থাপনার সাথে পুরোপুরি সহযোগিতা করা উচিত। এছাড়া ব্যবস্থাপনা ও দায়িত্ব পালনকারীদের উচিত হবে আতিথ্যের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের চেষ্টা করা। অনুরূপভাবে দায়িত্ব পালনকারী এবং জলসায় যোগদানকারী প্রত্যেকেই আসে-পাশের পরিবেশ ও পরিস্থিতির প্রতিও সজাগ দৃষ্টি রাখুন। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে সকল প্রকার অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন আর এ জলসাকে সর্বৈব কল্যাণময় করুন।

(জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ ও বাংলা ডেস্কের যৌথ প্রচেষ্টায় অনুদিত)

জুমুআর খুতবা

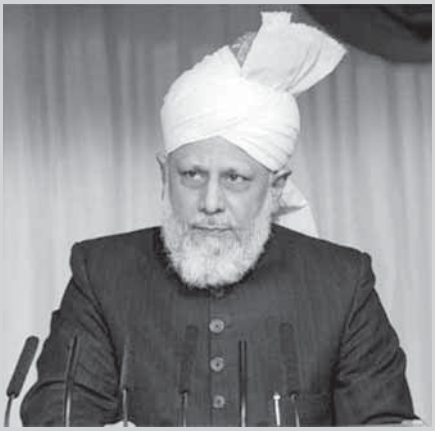

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ মসজিদে ১৫ অক্টোবর, ২০০৪-এ প্রদত্ত জুমুআর খুতবা

রমযানে রোযার গুরুত্ব ও তাৎপর্য

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۞ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۞ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۞
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۞ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۞

রোযা কেবল পানাহার থেকে বিরত থাকার নাম নয় এর সাথে ইবাদত বান্দেগী করা সকল প্রকার মন্দ কাজ হতে বিরত থাকা আবশ্যক।

তাশাহ্হুদ, তা'আউয ও সূরা ফাতিহার পর সূরা বাকারার আয়াত ১৮৪-১৮৬ তেলাওয়াত ও তরজমা করেন ঃ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿۱۸۴﴾

اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ ؕ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ؕ وَ عَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ ؕ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ ؕ وَ اَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿۱۸۵﴾

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْۤ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ بَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَ الْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ؕ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ؕ يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿۱۸۶﴾

হে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরয করা হয়েছিল যেন তোমরা তাক্ওয়া অবলম্বন কর। নির্দিষ্ট দিনগুলোতে (রোযা ফরয), কিন্তু তোমাদের মাঝে যদি কেউ অসুস্থ হয় অথবা সফরে থাকে, তাহলে তাকে অন্য সময় এ সংখ্যা পূর্ণ করতে হবে; এবং যাদের পক্ষে এটা (রোযা রাখা) ক্ষমতার বাইরে, তাদের ফিদিয়াথ–এক মিকীনকে আহার কারানো।

অতএব, যে কেউ স্বেচ্ছায় পূর্ণকর্ম করবে, সেটা অবশ্য তার জন্য উত্তম হবে। আসলে তোমরা যদি জ্ঞান রাখ তাহলে জানবে যে, তোমাদের জন্য রোযা রাখাই কল্যাণকর।

রমযান মাস সেই মাস যাতে কুরআন নাযেল করা হয়েছে, যা মানবজাতির জন্য হেদায়াত স্বরূপ এবং হেদায়াত ও ফুরকান (সত্য মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টিকারী) বিষয়ক সুস্পষ্ট প্রমাণাদিস্বরূপ।

সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে কেউ এ মাসকে পায় সে যেন রোযা রাখে; কিন্তু যে কেউ রুগ্ন অথবা সফরে থাকে অন্য দিনে গণনা পুরা করতে হবে, আল্লাহ্ তোমাদের জন্য স্বাচ্ছন্দ্য চান এবং তোমাদের জন্য কাঠিন্য চান না এবং যেন তোমরা গণনা পূরা কর এবং আল্লাহ্র মহিমা-গীত গাও এ জন্য যে, তিনি তোমাদেরকে হেদায়াত দিয়েছেন এবং যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

তারপর হুযূর (আই.) বলেন ঃ কাল থেকেই ইনশাআল্লাহ্ রোযা আরম্ভ হচ্ছে, কোন কোন স্থানে আরম্ভ হয়েও গেছে। আমি শুনেছি এখানে কিছু কিছু মানুষও রোযা রাখতে আরম্ভ করে দিয়েছেন। এ মাস একদিকে যেমন মু'মেনদের জন্য যারা আল্লাহ্ তাআলার আদেশ সমুহ

পালন করে তাদের জন্য বরকত নিয়ে আসে তেমনই শয়তানের জন্য, শয়তানের সহচর ও সহযোগীদের জন্য দুঃখ-কষ্ট নিয়ে আসে।

হাদীসে আছে, এ মাসে শয়তানকে বেঁধে দেয়া হয়। কারণ মু'মেন মানুষেরা এ মাসে যখন বেশি বেশি তাক্‌ওয়া অবলম্বন করতে চায়, শয়তানের আক্রমণ হতে বাঁচতে চায় এটাই শয়তানের জন্য কষ্টের কারণ হয়।

শয়তানকে বেঁধে দেয়ার অর্থ এই যে, বান্দারা যখন আল্লাহ্‌র খাতিরে জায়েয বা হালাল দ্রব্যসমূহ হতে নিজকে বিরত রাখে তখন নিষিদ্ধ কাজ কর্ম থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে অনেক বেশি বেশি চেষ্টা করে যেসব কাজে শয়তান উৎসাহ দিয়ে থাকে।

যারা দূর্বল ঈমানের মানুষ যাদের অন্তরে পবিত্র রমযানের প্রতি বেশি শ্রদ্ধাবোধও থাকে না তারা রমযান মাসেও পুরোপুরি শয়তানের আয়ত্বেই থাকে। তারা তো রমযান মাসেও আল্লাহ্‌ তাআলার ইবাদতে অলসতা দেখায়; এমন পবিত্র মাসেও তারা মানুষের অধিকার তাদের না দিয়ে নিজেরা ভোগ করতে প্রস্তুত থাকে। সুযোগ পেলেই তা ভোগ দখল করে নেয়–মানুষকে কষ্ট দেয়।

মোটকথা, পবিত্র রমযান মাস বরকতপূর্ণ মাস। মানুষের উচিৎ বিশুদ্ধচিত্তে আল্লাহ্‌র ইবাদত করা–এবং সাধারণতঃ মানুষ তা করে। এটি বরকতপূর্ণ মাস। মানুষ এ সময় আল্লাহ্‌র আদেশ মেনে চলে; প্রত্যেক পূণ্যকর্ম করতে চেষ্টা করে এবং পুণ্য কাজ করে যেসব কাজের আদেশ আল্লাহ্‌ দিয়েছেন। প্রত্যেক মন্দকাজকে পরিত্যাগ করে আল্লাহ্‌ যেসব কাজ থেকে বিরত থাকার আদেশ দিয়েছেন। অধিকন্ত, কিছু কিছু জায়েজ সুযোগ-সুবিধা ও কিছু সময়ের জন্য ছেড়ে দেয়–যার আদেশ আল্লাহ্‌ তাআলা দিয়েছেন।

আল্লাহ্‌ তাআলা বলেছেন, এ রোযা এজন্য ফরয করা হয়েছে এবং এ সমস্ত আদেশ নিষেধ এজন্য করা হয়েছে যেন তোমরা তাক্‌ওয়া অবলম্বন করে এগিয়ে যাও। তাক্‌ওয়া কী জিনিস? তাক্‌ওয়া এই যে, তোমরা পাপ হতে বিরত থাক, পাপ বর্জন করে যেতে চেষ্টা কর–এবং এভাবে এটা কর যেভাবে কেউ ঢালের আড়ালে এসে নিজকে নিরাপদ করতে চেষ্টা করে; মানুষ কোন জিনিসের পেছনে গিয়ে নিজকে বাঁচাতে চেষ্টা করে।

তার মনে ভয় থাকে। কোন ভয়ের কারণে তার থেকে নিজকে বাঁচাবার জন্য চেষ্টা করে। আল্লাহ্‌ বলেছেন যে, রোযা রাখ, যেভাবে রোযা রাখার নির্দেশ। সেভাবে রোযা রাখ তবে তাক্‌ওয়ার পথে এগিয়ে গিয়ে উন্নতি লাভ করবে। নতুবা, হদিসে আছে যে, 'তোমাদেরকে অভুক্ত রাখার কোন ইচ্ছা আল্লাহ্‌ তাআলার নাই, প্রয়োজন ও নাই। আল্লাহ্‌ তো বলেছেন, তোমরা যে সমস্ত ভুল-ভ্রান্তি করেছ, তার কুফল থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করার জন্য আমি তোমাদের জন্য পথ করে দিয়েছি।

যেন তেমরা বিশুদ্ধচিত্তে (তওবা করে) পুণরায় আমার কাছে আস। তোমরা রমযানের এ পবিত্র মাসে যথাযতভাবে রোযা রাখ, আমার খাতিরে তোমরা হালাল বস্তু, হালাল জিনিস গ্রহণ করা থেকে বিরত থাক–তোমাদের এ প্রচেষ্টার ফলে আমি তোমাদের প্রতি রহমতের দৃষ্টিপাত করব এবং শয়তানকে বেঁধে রাখব। তোমরা যেন এ ভয়ের কারণে রোযা পালন কর, রোযার আড়ালে নিজেকে রেখে তাক্‌ওয়া অবলম্বন করে নিজেদেরকে নিরাপদ কর; যেন শয়তান তোমাদের ক্ষতি সাধন করতে না পারে।

বলেছেন, এটা হলো তাক্‌ওয়া এবং ঢাল–এর আড়ালে গিয়ে শয়তানের আক্রমণ থেকে, পাপকর্ম করা থেকে নিজকে বিরত রাখার চেষ্টা ও রোযা রাখার কারণে তোমরা নিরাপদ হতে পার।

এমন এক সংগ্রাম করে তোমারা যখন আল্লাহ্‌র নিরাপদ আশ্রয়ে এসে যাও তারপর এ নিরাপদ আশ্রয়ের মধ্যে থেকে যাওয়ার চেষ্টা করা উচিত। এরপর এ আশ্রয়স্থল–এ তাক্‌ওয়াকে সৎকর্ম দ্বারা আল্লাহ্‌র আদেশ নির্দেশ মেনে চলার মাধ্যমে মজবুত, আরো মজবুত করতে হবে। যারা পূর্বে থেকে পূণ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত আছেন, তারা রোযার মাধ্যমে তাকওয়ার উন্নতস্তর লাভ করতে থাকেন এবং উন্নতি লাভ করতে করতে আল্লাহ্‌র খুব কাছা কাছি চলে যেতে থাকেন।

স্মরণ রাখা উচিত, রোযা কেবল এতটুকুই না যে, কিছু সময় খানা-পিনা থেকে বিরত থাকলেই তাক্‌ওয়ার উন্নত মান লাভ করা যাবে। যেমন উল্লেখ করেছি রোযা রাখতে হবে এবং সাথে সাথে অনেক মন্দ কাজ করা ছেড়ে দিতে হবে। তার সাথে আল্লাহ্‌র ইবাদতে আগের চেয়ে এগিয়ে যেতে হবে তবেই তাক্‌ওয়া অর্জিত হবে এবং এতে অগ্রগতি ও হবে।

হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আ.) বলেছেনঃ "মানুষ (সাধারণতঃ) রোযার হাকিকাত (বাস্তবতা) সম্পর্কে অবহিত নয়। আসল ঘটনা এই যে, মানুষ যে দেশে কখন ও যায়নি, বা দেখেনি–সে দেশের কি অবস্থা সে কি করে বলবে? রোযা শুধু এতটুকুই নয় যে, মানুষ পানাহার না করে থাকবে। বরং রোযার বিরাট বাস্তবতা, বিরাট প্রতিফলন আছে যা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জানা যায়।

মানুষের প্রকৃতির মধ্যে আছে যে, মানুষ যত কম খাবে তত বেশি আত্মিক বা আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করবে। কাশ্‌ফ বা দিব্যদর্শন ক্ষমতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। আল্লাহ্‌র ইচ্ছা এই যে, তোমরা বাহ্যিক খদ্য জমিয়ে রূহানী খাদ্য বৃদ্ধি কর। রোযাদার ব্যক্তি যেন ভাল করে মনে রাখে যে, কেবল অভূক্ত থাকা আসল উদ্দেশ্য নয়! বরং তার উচিত আল্লাহ্‌র স্মরণ বা যিক্‌রে ইলাহীতে রত থাকা, যেন সে সাংসারিক জীবন থেকে বিচ্যুত হয়ে আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে।"

অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সাথে যেন ভালবাসা সৃষ্টি হয় এবং ইহজগতের আকর্ষণ কেটে যায় এবং অনিহা সৃষ্টি হয়, দুনিয়া ছেড়ে যাবার চিন্তা হয়। "সুতরাং রোযার উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ যেন এমন খাদ্য গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে যা শরীর গঠন করে এবং এমন খাদ্য গ্রহণ করে যাতে আত্মা বা রূহানী তৃপ্তি ও প্রশান্তি লাভ হয়। যারা বিশুদ্ধচিত্তে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে রোযা রাখেন, তারা তো কেবল জাগতিক প্রথা হিসেবে এবং সামাজিক রীতি হিসেবে রাখেন না, তাদের উচিত তারা যেন আল্লাহ্‌র হাম্‌দ (প্রশংসা) ও তাসবীহ্‌ ও তাহলিল-এ রত থাকেন।"

অর্থাৎ হাম্‌দ করতে থাক, তাসবীহ্‌

(পবিত্রতা ঘোষণা) করতে থাক এবং আল্লাহ্‌র মহিমা প্রকাশ করতে থাক এবং কেবল তাঁকে সবকিছু বলে জান। "যেন তারা অপর খাদ্যটি (রূহানী) গ্রহণ করতে পারে।"(মলফুযাত; ৫ম খন্ড, পৃঃ ১০২ নুতন সংস্করণ)

হযরত ইমাম মাহদী (আ.) বলেছেন, তোমরা রোযা রেখে তখন উপকৃত হতে পার যখন তোমরা শরীরের খুরাক কম করে রূহ (আত্মার)-এর খুরাক বৃদ্ধি করবে। সাংসারিক ঝামেলার মধ্যে খুব বেশি জড়িয়ে থেকে না সারাক্ষণ রোযা রেখে। ভোর হওয়ার পূর্বে সেহরী খেয়ে সারা দিন দুনিয়ার কাজ কার্মে মেতে থাকলেও অনেক দুনিয়াদার ও তো স্বাস্থ্য রক্ষার খাতিরে অথবা ফ্যাশনের খাতিরে খুরাক কম করে দেয়।

সুতরাং তোমাদের খাদ্য কম করা যেন শারীরিক সৌন্দর্যের কারণে অথবা স্বাস্থ্যের কারণে যেন না হয়, বরং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই যেন হয়।

আর এ উদ্দেশ্য তখনই লাভ করা যেতে পারে যখন আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক দিন দিন বৃদ্ধি হতে থাকবে। বেশি বেশি তাসবীহ্ করতে থাকবে এবং সকল কাজে আল্লাহ্‌কে সর্বশক্তিমান জানতে হবে এবং সর্বদা তাঁর প্রতি ঝুঁকে থাকতে হবে। তাহলে রোযা তোমাদেরকে শয়তানের হাত থেকে রক্ষা করবে। তাক্‌ওয়া ও বৃদ্ধি পাবে। নতুবা যেমন আমি বলেছি, অগণিত মানুষ এমন আছে, মুসলমানদের মধ্যে ও আছে, বিশেষ করে যাদের শয়তান কোন বাঁধন ছাড়াই ঘুরে বেড়াচ্ছে যারা কখনই বাঁধা পড়ে না। কারণ তারা তাক্‌ওয়া অবলম্বনের চেষ্টা কখনও করে না, তারা কোন কিছুকে ভয় ও করে না। আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, 'তাক্‌ওয়া লাভের উদ্দেশ্যে, পুণ্য কাজে অগ্রসর হওয়ার উদ্দেশ্যে, শয়তানের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে যে ট্রেনিং কোর্স আছে–সেটা খুব দীর্ঘ দিনের জন্য নয় যে, তোমরা ঘাব্‌ড়ে যাবে যে, এত দীর্ঘদিন পানাহার ছাড়া কি করে কাটাবে।

বছরে তো মাত্র ক'টা দিন। বছরের ৩৬৫ দিনের মধ্যে মাত্র ২৯ বা ৩০ দিনের ব্যাপার। এতটুকু কষ্ট বা ত্যাগ স্বীকার তো করতেই হবে। যদি শয়তানের হাত থেকে রক্ষা পেতে চাও।

শুধু শয়তানের হাত থেকে রক্ষা পাওয়াই নয়, অতিরিক্ত এই যে, "আমার সন্তুষ্টি ও লাভ করবে, যদি আমার সন্তুষ্টি লাভ করতে, আমার নৈকট্য লাভ করতে চাও।" তারপর বলেছেন, যদি কেউ অসুস্থ্য হয় অথবা মুসাফির হয়, মানুষের অসুখ-বিসুখ তো লেগেই থাকে, পরিস্থিতির কারণে সফরে ও বের হতে ই হয়; তো অসূখ বা সফরের কারণে যে কয়েকটি রোযা বাদ পড়ে যায়–তা পরবর্তীতে বছরের যে কোন সময় পুরা করবে। এ সুযোগ ও আল্লাহ্ তাআলাই দিয়েছেন।

বলেছেন, তোমরা যেহেতু আমার কাছে আসতে এবং আমার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে চেষ্টা করছ এবং একটি বিশেষ প্রচেষ্টা বা সংগ্রাম করছ, এজন্য আমি তোমাদের প্রকৃতগত অসুবিধা বা কোন আকস্মিক অপারগতার কারণে তোমাদের জন্য এ সুযোগ রেখেছি যে, যে কয়েকটি রোযা বাদ পড়ে যায় সেগুলো বছরের যে কোন সময় পুরণ করবে। আল্লাহ্ বলেছেন, তোমরা যে চেষ্টা করছ তার মূল্য দিতে আমি এ সুযোগ দিয়েছি। তোমরা বছরের যে কোন সময় এ কষ্ট করতে পার–আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য। যেহেতু তোমরা এ সব কিছু আমার জন্য করছ তাই যদি তোমরা এ সময় অসুস্থ হয়ে পড়, অথবা সফর করতে গিয়ে অনেকগুলো রোযা বাদ পড়ে যায় তাহলে অন্য দিনে রোযাগুলো রাখ। আর যদি তোমাদের আর্থিক অবস্থা ভাল থাকে এবং তোমার এর জন্য যদি ফিদিয়া দিয়ে দাও তাহলে আরো ভাল হয় এভাবে তোমরা অতিরিক্ত পুণ্য অর্জন করতে পার। যারা দীর্ঘকাল ধরে অসুস্থ্য বা চিররুগী অথবা এমন মহিলা যারা কোলের শিশুকে দুধ পান করাচ্ছে, অথবা কিছু দিনের মধ্যে শিশুর জন্ম দিতে যাচ্ছে তারা রোযা রাখতে পারে না; এরাও অসুস্থ্যদের মত। এরাও সামর্থ থাকলে ফিদিয়া দিবে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এক প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন,

"শুধুমাত্র ফিদিয়া দেয়া (পরবর্তিতে রোযা না রেখে–[অনুবাদক]) তো কেবল শেখ ফানী বা অনুরূপদের জন্য হতে পারে যারা কখনই রোযা রাখতে পারে না। নতুবা সর্ব সাধারণ যারা সুস্থ্য হয়ে রোযা রাখতে পারে তারাও যদি কেবল ফিদিয়া (রোযা না রাখে) দেয়া যথেষ্ট মনে করে তাহলে তো (এবাহানা) স্বেচ্ছা চারিতার দরজা খুলে দিবে।" (মলফুযাত, ৫ম খন্ড, পৃঃ ৩২২)

অর্থাৎ এমন এক অনুমতি লাভের পথ খুলে যাবে যে যখন যার যে ইচ্ছা করবে সে তখন নিজ মর্জি মত সেরকম ব্যাখ্যা দিতে শুরু করবে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) উপরোক্ত বক্তব্যের আরম্ভে "শুধুমাত্র" শব্দটি ব্যবহার করেছেন। অর্থ এই যে, যারা অসুস্থতার কারণে রোযার মাসে রোযা রাখতে পারেনি তারা পরবর্তিতে সুস্থ হয়ে রোযা রাখবে এবং ফিদিয়া ও দিবে তখন এটা তাদের জন্য অতিরিক্ত ছওয়াবের কারণ হবে। কিন্তু যারা কখন ও রোযা রাখতে পারবে না (স্বাস্থ্যগত কারণে) তাদের জন্য ফিদিয়ার ব্যবস্থা।

ফিদিয়া সম্পর্কে বিভিন্ন তফসীরকারকগণ বিভিন্ন রকম তফসীর করেছেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, 'যারা সাময়িকভাবে অসুস্থ তারা সুস্থ্য হয়ে উঠে রোযা রাখবে–ফিদিয়া দিতে পারলে ফিদিয়া ও দিবে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আরো বলেছেনঃ "ওয়া আলাল্লাযীনা ইউতিকুনাহু ফীদ্ ইয়াতুন তাআমু মিসকীন" অর্থঃ যরা সামর্থবান তারা ফিদিয়া দিবে–এক মিসকীনের (একদিনের খাদ্য) খাবার"–(এ সম্পর্কে) আমার মনে একদিন প্রশ্ন জাগল যে, এই ফিদিয়া কেন রাখা হয়েছে? তখন জানতে পারলাম, 'সামর্থ লাভের জন্য–যেন রোযা রাখার শক্তি লাভ হয়।

তিনিই মহান আল্লাহ্ তাআলা যিনি রোযা রাখার শক্তি দান করেন। প্রত্যেকটি জিনিসই তাঁর কাছে চাওয়া উচিত। খোদা তাআলা তো সকল শক্তির অধিকারী–যদি তিনি চান তাহলে এক অত্যান্ত দূর্বল ব্যক্তিকে ও রোযার শক্তি দিতে পারেন। সুতরাং ফিদিয়ার ব্যবস্থা এজন্যই যে, যেন শক্তি লাভ হয়–এটা নিতান্তই তাঁর ফযল।

অতএব, আমার মতে এটা বড় চমৎকার, দোয়া যে, হে আল্লাহ্! এটা তোমার বড়

বরকতের মাস। অথচ আমি তো বঞ্চিত থেকে যাচ্ছি! জানি না আগামী বছর জীবিত থাকি কি না থাকি, অথবা এ মাসে যে সব রোযা রাখতে পারব না ঐ রোযাগুলো পরবর্তিতে রাখতে পারব কি না।

এভাবে যদি কেউ দোয়া করে তাহলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস এমন হৃদয়কে খোদা তাআলা রোযা রাখার শক্তি দিবেন।" [মলফুযাত, ২য় খন্ড, পৃঃ ৫৬৩]

সুতরাং হযরত (আ.) এখানে বললেন, যারা রোযার মাসে সাময়িকভাবে বাধাগ্রস্থ হয় তারা ফিদিয়া দিলে আল্লাহ্ তাআলা তাদের রোযা রাখার সুযোগ করে দিবেন। ফিদিয়া ও দিবে, দোয়াও করবে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আরো বলেছেনঃ

"আসল কথা এই যে, কুরআন শরীফে যে সব সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে বলা হয়েছে সে সব সুবিধাগুলো ভোগ করা ও তাক্ওয়ার অন্তর্ভূক্ত। আল্লাহ্ তাআলা মুসাফির এবং রোগীদের জন্য অন্য সময় রোযা রাখার অনুমতি দিয়েছেন। এ আদেশকে ও তো মান্য করা উচিত! আমি পড়েছি, অধিক সংখ্যক বুযুর্গান এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, 'যদি কোন ব্যক্তি সফররত অবস্থায় অথবা অসুস্থ অবস্থায় রোযা রাখে তাহলে এটা আবাধ্যতা।"

অর্থাৎ গুনাহ্র কাজ। "কারণ আসল উদ্দেশ্য আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভ করা–নিজের ইচ্ছাকে প্রতিষ্ঠিত করা নয়! আল্লাহ্র সন্তুষ্টি তাঁর আনুগত্যের মধ্যে রয়েছে। তিনি যা আদেশ করেন তা যেন পালন করা হয়। নিজ পছন্দমত এর মধ্যে কিছু সংযোজন হওয়া উচিত না। (অর্থাৎ নিজেদের ব্যাখ্যা কে শামিল করা উচিত না।)

তিনি তো আদেশ করেছেন, "তোমাদের মাঝে যারা অসুস্থ অথবা সফররত তারা পরবর্তি সময়ে রোযা রাখবে। (সূরা বাকারা ঃ ১৮৫) এখানে কোন শর্ত রাখা হয়নি যে, সফর কি রকম হতে হবে বা কেমন অসুখ, কোন অসুখ হতে হবে। হযরত (আঃ) বলছেন ঃ আমি তো সফরে রোযা রাখি না অসুস্থ অবস্থাতে ও না এবং আজকে ও আমার শরীর খারাপ থাকাতে আমি রোযা রাখিনি।"[মলফুযাত, ৫ম খন্ড, ৬৭-৬৮ পৃঃ]

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন ঃ

"যে ব্যক্তি রোযার মাসে অসুস্থ অবস্থায় অথবা সফররত অবস্থায় রোযা রাখে সে সরাসরি আল্লাহ্র আদেশের অবাধ্য হয়। আল্লাহ্ স্পষ্ট করে বলেছেন; অসুস্থ অথবা মুসাফির যেন রোযা না রাখে। অসুস্থ্য ব্যক্তি সুস্থ হয়ে উঠে তারপর এবং মুসাফির সফর শেষ করে বাড়ী এসে রোযা রাখবে।

আল্লাহ্র এ আদেশ পালন করা উচিত। কারণ মুক্তি আল্লাহ্র ফযলে লাভ হয়, আমল বা কর্মক্ষমতা প্রদর্শন করে কেউ মুক্তি লাভ করতে পারবে না। খোদা তাআলা একথা বলেননি যে, রোগের আক্রমণ অল্প বা বেশী, সফর লম্বা বা ছোট হলে–বরং এ আদেশ সাধারণভাবে (কোন শর্ত ছাড়া) দেয়া হয়েছে। এ আদেশ পালন হওয়া চাই।

মুসাফির বা অসুস্থ ব্যক্তি যদি রোযা রাখে তাহলে তার বিরুদ্ধে আদেশ অমান্য করার ফতোয়া জারী হবে।" [মলফুযাত, ৫ম খন্ড, পৃঃ ৩২১]

এমন মানুষ অনেকেই আছে যারা নিজের উপর অনেক বেশি অপ্রয়োজনীয় কঠোরতা আরোপ করে নেয় অথবা এমন করার চেষ্টা করে। বলে যে, আজকাল সফরের অনেক সুযোগ সুবিধা হয়েছে এ সফর কোন সফরই না।

অতএব, রোযা রাখা জায়েয। হযরত (আ.) এ কথারই ব্যাখ্যা করেছেন যে, নিজের উপর অযথা কষ্ট আরোপ করা কোন নেকী নয়। বরং নেকী এই যে, আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশ মেনে চলতে হবে। নিজের তরফ থেকে বিভিন্ন প্রকার ব্যাখ্যা খুঁজে বের করা ঠিক নয়। যা সুস্পষ্ট নির্দেশ তা মান্য করতে হবে। বড় সুস্পষ্ট আদেশ এই যে, অসুস্থ এবং মুসাফির মানুষ রোযা রাখবে না। সুতরাং এ আদেশ পালন করাতেই বরকত রয়েছে; এটা নয় যে, নিজ চেষ্টায় জোরপূর্বক খোদা তাআলাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করতে হবে।

রেওয়ায়াতে আছে, হযরত ইবনে ওমর (রা.) বর্ণনা করেছেন, আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, এক ব্যক্তি রমযান মাসে সফররত অবস্থায় রোযা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছেন আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, রমযান মাসে সফররত অবস্থায় রোযা রেখো না। ঐ ব্যক্তি বলেছেন, হে আল্লাহ্র রসূল! আমি রোযা রাখার ক্ষমতা রাখি।

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, "আনতা আকওয়া আমেল্লাহ্!"

তুমি বেশি শক্তিধর না কী আল্লাহ্? নিশ্চয় আল্লাহ্ আমার উম্মতের রোগী এবং মুসাফিরদের জন্য রমযান মাসে রোযা না রাখার সুযোগ দিয়েছেন সদকা হিসেবে। (তোহফা হিসেবে)

তোমাদের কেউ কী পছন্দ করে যে, তুমি কাউকে কোন জিনিস সদকা (তোহফা) দাও। এবং যদি যাকে দিয়েছ তুমি সে [গ্রহণ না করে] ফেরত দিয়ে দেয়? [আন মুসান্নেয় লিলহাফেজ আল কবির আবি বকর আব্দুর রাজ্জাক বিন হামাম আসসানানী, ২য় খন্ড, পৃঃ ৫৬৫]

সুতরাং এতো খোদা তাআলার পক্ষ থেকে (তোহফা) উপহার স্বরূপ যাচ্ছে।আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন যে, কুরআন শরীফ একটি সম্পূর্ণ শরিয়তগ্রন্থ এবং এরমযান মাসে নাযেল করা হয়েছে। হাদীসে আছে, সারা বছরে যতটা কুরআন নাযেল হয়েছিল রমযান মাসে পুনরায় সে অংশটুকু হযরত জিব্রাইল (আ.) এসে হযরত নবীয়ে করীম (সা.)-কে শোনাতেন।

আঁ-হযরত (সা.)-এর ইন্তেকালের পূর্বে তাঁর (সা.) জীবনের শেষ রমযান মাসে পুরোটা কুরআন দু'দফা হযরত জীব্রাইল (আ.) হুযূর (সা.)-কে শুনিয়েছেন। বলা হয়েছে যে, এটি অতীব মহিমান্বিত হেদায়েত সম্বলিত গ্রন্থ।

অতএব, পবিত্র এ মাসে যেন এ গ্রন্থকে খুব গভীর মনোনিবেশ সহকারে পাঠ করা হয়। সারা বছরই পড়তে হয়।কিন্তু এ মাসে খুব বেশি মনোযোগ দিয়ে পড়তে হয়। অনুবাদ সহ পড়তে হয়। যেসব জামাতে দরসে কুরআন এর ব্যবস্থা আছে সেখানের মানুষ যেন দরস শোনে। কারণ অনেক কথা নিজে পড়ে জানা যায় না।

এভাবে আস্তে আস্তে গভীর জ্ঞান লাভ করা যাবে। সকল বিষয় সকল আদেশ-নিষেধ সুস্পষ্ট ভাবে জানা যাবে এবং তোমরা কুরআনের শিক্ষার আলোকে নিজেদের জীবনকে গড়তে পারবে। পরবর্তি আয়াতে পুনরায় তাকিদ করা হয়েছে যে, রোযা পালন কর, অসুস্থ এবং মুসাফেররা তখন রোযা রাখবে না, পরবর্তী সময়ে সুযোগ মত ছুটে যাওয়া রোযাগুলো রাখবে।

আল্লাহ্ তাআলার ফযল সমূহ, তাঁর অনুগ্রহ ও নেয়ামত সমূহ স্মরণ করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। তাঁর সামনে বিনত হও। কৃতজ্ঞ বান্দা হও। এভাবে তোমরা আরো বেশি নেকী অর্জন করতে পারবে এবং তাক্ওয়ার মান উন্নত হবে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন ঃ "শাহরু রামাযানাল্লাযী উনযিলা ফীহিল কুরআনু" [(বাকারা ঃ ১৮৬) অর্থঃ রমযান মাসে কুরআন নাযেল হয়েছে] এর থেকে রমযান মাসের মহিমা জানা যায়। সুফীয়ায়ে কেরাম (যারা নিজেদের হৃদয়কে রমযান মাসে পবিত্র করেছেন) তারা লিখেছেন যে, হৃদয়কে আলোকিত করার জন্য এটি খুবই উপযুক্ত মাস। এ সময় খুব ঘন ঘন কাশফ্ (দিব্যদর্শন) বিকশিত হয়।

নামাযের দ্বারা (নফ্স) আত্মার পবিত্রতা অর্জন হয়। রোযা দ্বারা হৃদয়ের উপর আলোর বিকাশ ঘটে। (নফস) আত্মার পবিত্রতা অর্থ নফ্সে আম্মারার দূর্বার প্রলোভন ও আকর্ষণ মুক্ত হওয়া।" নফ্সে আম্মারা মানুষকে পাপের প্রতি আকষ্ট করে। "হৃদয়ে আলোর বিকাশ অর্থ কাশফ্-এর (দিব্য দর্শন) দরজা খুলে যাওয়া যার ফলে খোদাতাআলাকে দেখা যায়।" [মলফুযাত, ২য় খন্ড পৃঃ ৫৬১)

সুতরাং রোযা রাখলে, কুরআন পড়লে ইবাদত করলে অন্তর আলোকিত হয়। আল্লাহ্র সাথে সম্পর্কও নৈকট্য লাভ হয়। নামায মানুষের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে। অতএব, রোযার দিনে নামাযের প্রতি ও খুব মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন যেন আত্মার পবিত্রতা অর্জন হয়। রোযার মাধ্যমে আত্মা আলোকিত হয়। আত্মা আলোকিত হওয়ার অর্থ এই যে, (হযরত (আ.) বলেছেন), আল্লাহ্র সাথে নিকট সম্পর্ক স্থাপিত হওয়া। এতটা ঘনিষ্ট সম্পর্ক যে, যেমন খোদাতাআলার সাথে দেখা হয়ে যাওয়া।

একটি হাদীসে আছে, হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন, আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, "আদম-সন্তানের প্রতিটি কাজ তার নিজের জন্য রোযা ছাড়া; রোযা সে আমার খাতিরে রাখে এবং আমিই তার পুরস্কার দিব। রোযা মানুষের জন্য ঢাল স্বরূপ। যখন তোমাদের কেউ রোযা রাখ, সে যেন যৌন বিষয়ে কথা না বলে, গালি-গালাজ না করে। কেউ যদি তাকে গালি দেয় বা ঝগড়া করতে চায়, তার জবাবে সে যেন কেবল এতটুকু বলে, 'আমি রোযা রেখেছি।'আমি সেই সত্ত্বার কসম খেয়ে বলছি, যাঁর হাতে মুহাম্মদের জীবন (সা.) রোযাদারের মুখের গন্ধ পর্যন্ত আল্লাহ্র কাছে এত ভাল লাগে যেমন কস্তুরীর সুগন্ধের চেয়েও ভাল লাগে। রোযাদারের জন্য দুইটি আনন্দ আছে যা তাকে খুশী করে। যখন সে রোযার ইফতার করে তখন সে খুশী হয় এবং যেদিন সে আল্লাহ্র সামনে হাজির হবে তখন সে খুশী লাভ করবে। (বুখারী কিতাবুস সওম)

এখান থেকে জানা গেল যে, আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, 'রোযা আমার জন্য। যে কাজ খোদার উদ্দেশ্যে করা তার মধ্যে কোন কিছু মিশ্রণ থাকে না এবং যে কাজ খোদার উদ্দেশ্যে করা হয় তা মানুষের সামনে প্রশংসা পাওয়ার নিমিত্তে প্রকাশ করা হয় না। বরং চেষ্টা করা হয় যেন বিষয়টি গোপন থেকে যায়। যে সমস্ত নেকীর কাজ মানুষের কাছে গোপন রেখে করা হয়, আল্লাহ্ বলেছেন এমন কাজের পুরস্কার স্বয়ং আমি নিজেই।

আরো বলা হয়েছে যে, রোযা ঢাল স্বরূপ। ঢাল আসলে নিজকে নিরাপদ করার একটি উত্তম পদ্ধতি যার আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রাখা যায়। এখানে ঢাল অর্থ যার আড়ালে নিজেকে রেখে শয়তানের আক্রমণ হতে নিজকে নিরাপদ রাখা এবং এটা তখনই সম্ভব যখন রোযার সাথে সাথে আল্লাহ্র ইবাদতে ও মনোযোগ দেয়া হবে। লড়াই ঝগড়া থেকে নিজকে দূরে সরিয়ে রাখতে হবে। এমনকি কেউ যদি তোমাকে গালি দেয় তবু ও তুমি রাগান্বিত হবে না। উত্তেজিত হবে না বরং বলতে হবে যে, আমি রোযা রেখেছি।

রমযান মাসে প্রত্যক আহমদী যদিও প্রতিজ্ঞা করে যে, সে প্রত্যেক পর্যায়ে, নিজ গৃহে, বাইরের সমাজে, বন্ধু-বান্ধবদের মাঝে ও এর নির্দেশ পালন করে যাবে তাহলে এই একটি কথা যে, কাউকে সে গালি দিবে না, লড়াই-ঝগড়া করবে না, আমি মনে করি যে, আমাদের সমাজের অর্ধেকের বেশি বিবাদের পরিসমাপ্তি ঘটতে পারে। এমন লোকেরা বিরাট আনন্দ লাভ করতে পারে তার সাথে এই খুশী যে, রোযার কারণে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ এটাও পরিস্কার হয়ে গেল যে, রোযার মাসের পরে ও এ কার্যক্রম জারি থাকবে।

কারণ সে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভ করবে এবং লাভ করে যাবে নতুবা এটা একটা সাময়িক ব্যাপার মাত্র। আল্লাহ্ তাআলা একথা তো বলেননি যে, রোযার মাসে আমার নৈকট্য লাভ কর। তারপর যা খুশী তা করতে থাক। বরং যে সমস্ত পুণ্য কর্ম করেছ এসবগুলোকে জীবনের অংশ বানিয়ে ফেল। হযরত ইবনে ওমর (রা.) বর্ণনা করেছেন, আঁ-হযরত (সা.) বলেছেন, 'কার্যক্রমের (আমল) অবস্থা সাত প্রকার। দুইটি কাজ এমন, যা করার ফলে দুইটি জিনিস আবশ্যক হয়ে পড়ে। আর দুই কাজ এমন যার সমান সমান ছওয়াব হবে। অপর একটি কাজ এমন যার পুরস্কার সাতশ' গুণ বেশি পাওয়া যায়। আর একটি কাজ এমন যার পুরস্কার কত তা আল্লাহ্ ছাড়া কেউ জানে না।যে কাজ (আমল) দুইটি এমন যার ফলে দুইটি জিনিস আবশ্যক হয় তা এই যে, কোন ব্যক্তি যে আল্লাহ্র সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে তার জন্য জান্নাত আব্যশক (ওয়াজিব) হয়ে যাবে। সে এমন ব্যক্তি যে আন্তরিকতার সাথে আল্লাহ্র ইবাদত করেছে, কোন কিছুকে তাঁর সাথে শরীক করেনি। যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় আল্লাহ্র হুযূরে হাজির হবে যে শির্ক করত? তাহলে তার জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব (আবশ্যক) হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি যে পরিমাণ মন্দ কাজ করবে সে পরিমাণ শাস্তি পাবে।

যে ব্যক্তি যে সমস্ত পুণ্য কর্মের উদ্দ্যোগ গ্রহণ করেছে কিন্তু ঐ সব কাজ করতে সুযোগ পায়নি তবু ও সে ঐ সমস্ত কাজ যারা সম্পদন করেছে তাদের সমান ছওয়াব প্রাপ্ত হবে। আর যে ব্যক্তি যে সমস্ত পুণ্যকর্ম সম্পদন করেছে সে এই দশগুণ ছওয়াব পাবে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় সম্পদ ব্যয় করেছে তাকে তার ব্যয়কৃত দিনার ও দিরহামকে সাতশ' গুণ বৃদ্ধি করে দেয়া হবে। তারপর বলেছেন, রোযা এমন কাজ যা আল্লাহ্‌র খাতিরে সম্পাদন করা হয় এবং এর পুরস্কার কি, বা কত তা কেবল আল্লাহ্ জানেন। [আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব; কিতাবুস সওম]

অন্যত্র বলেছেন, 'রোযার পুরস্কার আমি স্বয়ং, যত বেশি তিনি দিতে চান দিবেন। সাতশ' গুণ প্রবৃদ্ধির অর্থ ও এই যে, এর চেয়ে ও বেশি হতে পারে। কারণ রোযাদার ব্যক্তি নিজের মধ্যে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন সৃষ্টি করে এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের চেষ্টা করতে থাকে। তারপর যখন বারবার চেষ্টা করতে থাকে তখন বারবার পুরস্কার প্রাপ্ত হতে থাকে।

হযরত সালমান ফারসী (রা.) বর্ণনা করেছেন, হযরত নবী করীম (সা.) একবার শা'বান মাসের শেষ দিন আমাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে বলেন, 'হে মানব মন্ডলী! তোমাদের উপর একটি মহান বরকতপূর্ণ মাস বিস্তার লাভ করতে চলেছে। এ মাসে এমন একরাত আসে যে রাত হাজার মাসের চেয়ে ও শ্রেষ্ঠতম। এ মাসে রোযা রাখা তোমাদের জন্য আল্লাহ্ ফরয করেছেন এবং এ মাসের রাতে (তাহাজ্জুদের) নামায পড়া নফল করেছেন। .....এটি এমন একটি মাস যার প্রথম অংশে রহমত, মধ্যম অংশে মাগফেরাত (ক্ষমা) এবং শেষাংশে জাহান্নামের আগুন হতে মুক্তি লাভ হয়।"..... যে ব্যক্তি কোন রোযাদারকে আহার করিয়ে পরিতৃপ্ত করবে তাকে আল্লাহ্‌তাআলা আমার হাওযে কাউছার থেকে এমন শরবত পান করাবেন যে সে জান্নাতে প্রবেশের পর আর কখন ও পিপাসাবোধ করবে না।" (সহী ইবনে খুযায়মা, কিতবুস সিয়াম)

এখানে কথাটা আরো পরিস্কার হয়ে গেল যে, এ মাসে রোযা ফরয করা হয়েছে–এ ব্যাপারে কোন প্রকার তালবাহানা বা হিলহুজ্জত করা যায় না। রোযা রাখতে হবে কিন্তু কেবল অভুক্ত থাকা নয় বরং ইবাদতে মনোযোগী হতে হবে। রাতে উঠে ইবাদতের জন্য দাঁড়াতে হবে। তবেই তো এ সমস্ত পুরস্কারের অধিকারী হওয়া যাবে। এবং জান্নাতে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা যাবে, যার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ্‌তাআলা দিয়েছেন।হযরত সালমান (রা.) বর্ণনা করেছেন, আঁ-হযরত (সা.) শা'বান মাসের শেষ দিন আমাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য পেশ করেছিলেন। আঁ-হযরত (সা.) সেখানে একথা ও বললেন, (পূর্বের রেওয়ায়াত, তবে এখানে আরো কিছু কথা আছে।) যে ব্যক্তি কোন ভাল গুণ রমযান মাসে নিজের চরিত্রের মাঝে শামীল করে সে ঐ ব্যক্তির মত হয়ে যায়, যে ব্যক্তি সেটা ছাড়া ও আরো সমস্ত দায়িত্ব পালন করেছে।

যে ব্যক্তি পবিত্র রমযান মাসে একটি জরুরী নির্দেশ বা করণীয় কর্তব্য পালন করে সে ঐ ব্যক্তির মত হয়, যে সত্তরটি করণীয় বা আদেশ পালন করেছে রোযা ছাড়া ও। রমযান মাস ধৈর্য ধারণের মাস এবং ধৈর্য ধারণের পুরস্কার জান্নাত। এ মাস ভালবাসা ও ভাতৃত্বস্থাপনের মাস এবং এ মাস এমন যে, এতে মোমেনগণকে বরকতমন্ডিত করা হয়।"

অর্থাৎ এ মাস ভ্রাতৃত্ব ভালবাসা, সমবেদনা প্রকাশ, সহযোগীতা ও দুঃখ দুর্দশা লাঘবের মাস। সুতরাং সকল দিক থেকে ধৈর্য ধারণের প্রয়োজন কেননা এটা ধৈর্য ধারণের মাস। ধৈর্য কিভাবে হবে? রোযা রেখে আমরা আহার গ্রহণ না করে ধৈর্য ধারন করি। ষড়রিপুর তাড়নাকে দমন করে রেখে ধৈর্যের পরিচয় দেই। মানুষের ব্যবহার দেখে ধৈর্য ধারন করি। নিজের অধিকার না পেয়ে ও সহ্য করি চুপ থাকি। কারণ আল্লাহ্‌র আদেশ যে, 'তোমরা লড়াই ঝগড়া কর না।' এর মাঝে এ আদেশ ও নিহিত যে, মানুষের প্রতি সমবেদনা, দুঃখ লাঘব করা, ক্ষমা করে যাওয়া তাইতো এ দ্বারা মানুষের উপরকার হয় এবং কল্যাণ প্রাপ্তি হয়। এভাবে ধৈর্য ধারন, অত্যাচার অনাচার দেখে ও সহ্য করে যাওয়া এতে করে রূহানী উন্নতি লাভ হয়। বাহ্যিকভাবে ও রিয্ক-এর বরকত হয়। যারা আল্লাহ্‌র খাতিরে কাজ করে আল্লাহ্ অভাব-অভিযোগ, প্রয়োজন মিটান। আল্লাহ্ তার জন্য ব্যবস্থা করেন।

হযরত আবু মাওউদ গাফফারী (রা.) বর্ণনা করেছেন ঃ 'রমযান মাস আরম্ভের একদিন পরে আঁ হযরত (সা.) কে বলতে শুনেছি যে, যদি মানুষ জানত যে, রমযান মাসের ফযিলত (মহিমা) কী, তাহলে আমার উম্মত আকাঙ্ক্ষা পোষণ করত যেন সারা বছরই রমযান হয়ে যায়।" এ কথা শুনে বনু খুযায়মার এক ব্যক্তি বললেন, হে আল্লাহ্‌র নবী! (সা.) আপনি আমাদেরকে রমযানের ফজিলতের কথা বলুন।

আঁ-হযরত (সা.) বললেন, নিশ্চয় বছরের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত জান্নাতকে রমযানের উদ্দেশ্যে সুশোভিত করা হয়। অতএব, যেই রমযান আরম্ভ হয় আল্লাহ্‌র আরশের নীচে বাতাস প্রবাহিত হতে শুরু করে দেয়।" [আত্‌তারগীব ওয়াত্ তারহীব, কিতাবুস সওম।]

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) রেওয়ায়াত করেছেন, আঁ-হযরত (সা.) বলেছেনঃ যেদিন রমযানের প্রথম রাত হয় তখন আল্লাহ্ তাআলা তাঁর বান্দাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। আর যখন বান্দাদের প্রতি দৃষ্টিপাত ঘটে তখন তিনি আর কখন ও তাদেরকে আযাবে নিক্ষেপ করেন না। আল্লাহ্ প্রতি দিন হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষকে জাহান্নাম হতে মুক্তি দান করেন। তারপর ২৯ রমযান তারিখের রাত নেমে আসে। এ রাতে তিনি ঐ পরিমাণ মানুষকে ক্ষমা করেন, যে পরিমাণ মানুষকে গত ২৮ রাতে ক্ষমা করেছেন।"
(ঐ) এখানে এ হাদীসে আছে ঃ "ওয়া ইযা নাযারাল্লাহু ইলা আবদীন লাম ইউয়ায্ যিবো আবাদান", এখানে 'আব্‌দ শব্দ ব্যবহার হয়েছে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি পুরোপুরি আল্লাহ্‌র আদেশ মেনে চলেছে, তাঁর প্রতি পুরো মাত্রাই অবনত হয়েছে ঝুঁকে পড়েছে; ইবাদতে অনেক এগিয়ে গিয়েছে। তাই বলা হয়েছে যে, আমার এমন বান্দাদেরকে একবার আমি আমার রহমত ও মমতার চাদরে জড়িয়ে নেব– তখন আর কে তার ক্ষতি করতে পারে? আল্লাহ্ তাআলা এমন ব্যক্তিদেরকেই

জান্নাতের ওয়ারিশ করবেন। আল্লাহ্ তাআলা সকলকে তাঁর বান্দা (অনুগত) হওয়ার শক্তি দান করুন।

হযরত আনাস বিন মালেক (রা.) বলেছেন, আমি আঁ-হুযুর (সা.) কে বলতে শুনেছি ঃ "যেই রমযান এসে যায় জান্নাতে দরজাগুলো খুলে দেয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়। শয়তানের পায়ে শিকল পরিয়ে দেয়া হয়। "সে ব্যক্তির সর্বনাস হয়ে গেছে যে রমযান পেয়েছে কিন্তু আল্লাহ্‌র ক্ষমা প্রাপ্ত হয়নি।" তো আর কবে সে তা পাবে? (তীবরানী আল আউসাত। আততারগীব ওয়াত তারহীব।")

এখানে প্রথম হাদীসের আরো বেশি ব্যাখ্যা পাওয়া গেল। আল্লাহ্ এমন সব ব্যবস্থা করে দিয়েছেন যে, মানুষ তাঁর প্রকৃত বান্দা (দাস) হয়ে যেতে পারে–তারপর ও যদি কেউ বান্দা হতে না চায়, রমযানের কল্যাণ লাভ না করে, ইবাদত বন্দেগী না করে; পূণ্যকর্মে অংশগ্রহণ না করে, তাহলে তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করা ছাড়া আর কি করা যেতে পারে?।'

আঁ-হযরত (সা.) বলেছেন, তার সর্বনাস হতে আর কোন বাধা নাই। কারণ সকল প্রকার রহমত লাভের সুব্যবস্থা ছিল কিন্তু সে ক্ষমাপ্রাপ্ত হতে পারেনি। সুতরাং ক্ষমা লাভের জন্য হুকুকুল্লাহ্ ও হুকুকুল ইবাদ (আল্লাহ্‌র প্রাপ্য ও বান্দাদের প্রাপ্য) আদায় করা এবং যথাযতভাবে আদায় করা আবশ্যক (আল্লাহ্ করুন)।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন, আঁ-হযরত (সা.) বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি ঈমানের অবস্থায় রোযা রেখেছে, নিজের হিসেব করেছে তার অতীতের সকল পাপ ক্ষমা করা হবে। তোমরা যদি জানতে যে রমযানের ফযিলত কি তাহলে তোমরা আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করতে যে, সারা বছরই যেন রমযান হয়ে যায়।" [আল জামে'অ আস্‌সহী মসনদ আল ইমাম আররাবীঅ বিন হাবীব।]

প্রথম হাদীসে যে বলা হয়েছে "হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষকে ক্ষমা করা হবে"–এর আরো ব্যাখ্যা এসে গেল যে, তারা ঈমানের অবস্থায় রোযা রেখেছে, ঈমান অবস্থায় রোযা রেখেছে এবং রোযার মধ্যে যা যা করণীয় তা সব করেছে। নিজের নফসকে (আত্মা) নিয়ন্ত্রণের রেখেছে। কড়া নজরে হিসাব কসেছে। এরকম না যে, তারা অন্যের উপর নজর রেখেছে, অন্যের ত্রুটি খুঁজেছে। বরং নিজের ত্রুটি খুঁজেছে, ক্ষমা প্রার্থনা করেছে আল্লাহ্‌র খাস বান্দাদের অন্তর্ভূক্ত হয়েছে, অফুরন্ত রহমতের অংশীদার হয়েছে।

নজর বিন শায়বান বলেছেন, 'আমি আবু সালামা বিন আব্দুর রহমানকে বললাম, আপনি আমাকে এমন কথা বলুন যা আপনি আপনার পিতার কাছ থেকে শুনেছেন; যা তিনি রমযান সম্পর্কে সরাসরি আঁ-হযরত (সা.) থেকে শুনেছিলেন। আবু সালমা বিন আব্দুর রহমান বললেন, হ্যাঁ আমাকে আমার পিতা আব্দুর রহমান (রা.) বলেছেন, আঁ-হযরত (সা.) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তাবারক ওয়া তাআলা তোমাদের উপর রোযা রাখা ফরয করেছেন। আমি তোমাদের মাঝে কিয়াম-এর (রাতে নফল নামায) প্রচলন করেছি।

অতএব, যে কেউ রমযান মাসে ঈমানের অবস্থায় ছওয়াবের নিয়্যত করে রোযা রাখবে সে এমন ভাবে পাপমুক্ত হয়ে যাবে যেমন তার মা তাকে জন্ম দিয়েছিলেন।" অর্থাৎ সম্পূর্ণ নিষ্পাপ শিশুর মত। [সুনান নিসায়ী কিতাবুস সিয়াম]হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ননা করেছেন, আঁ-হযরত (সা.) বলেছেনঃ "রোযা ঢাল স্বরূপ এবং আগুন হতে রক্ষার জন্য মজবুত দুর্গ স্বরূপ।" (মসনদে আহমদ ২য় খন্ড, ৪০২ পৃঃ)

এটা দূর্গ বটে। তবে ঢালের আড়ালে। কতকাল পর্যন্ত এ দুর্গ নিরাপত্তা দিবে? এর ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে এভাবে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত মিথ্যা অথবা কুৎসা রটনার দ্বারা এ দুর্গকে চিরে ফেলবে না।

অতএব, রমযানের রোযার কল্যাণ ততক্ষণ লাভ করা যাবে যতক্ষণ এ ধরনের ছোট ছোট পাপ যা ছোট মনে হয় কিন্তু আসলে ছোট নয়।

এসব মন্দ বা অনাচারগুলো মাথা তুলতে না পারবে। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় অনাচার যা মানুষ অনুমান করতে পারে না তা হলো মিথ্যাচার। যদি মিথ্যা কথা বলছ–তাহলে এর অর্থ এই যে, ঐ ঢালকে কেটে ফেলছ! মানুষের সম্পর্কে তাদের কুৎসা রটিয়ে বেড়াচ্ছে একজনের কথা অপরজনকে গিয়ে বলে দিচ্ছ; কোন ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার মন্দ কথা প্রকাশ করছ তার অর্থ এই যে, রোযার ঢালকে কেটে ফেলছ।

অর্থাৎ রোযা যদি এর সকল আনুসাংগিক উপকরণ সমূহ সহকারে পালন কর তাহলে তা ঢাল হয়ে থাকবে। নতুবা অন্যত্র যেমন বলা হয়েছে যে, রোযা কেবল ক্ষুধা এবং পিপাসা ছাড়া আর কিছুই না যা মানুষ সহ্য করছে।

আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে সমস্ত শর্তাবলী সহকারে রোযা রাখার শক্তি দান করুন। কেবল আল্লাহ্‌র জন্য যেন রোযা রাখতে পারি আমরা। মানুষকে দেখাবার জন্য যেন না হয়। নফস বা অন্তরের কোন বাহানা যেন আমাদের রোযার পথে বাধা না হয়ে দাঁড়ায়। এ মাসে যেন আমরা ইবাদতকে প্রাণবন্ত করে তুলতে পারি।

আল্লাহ্ করুন।আমরা এ রমযান মাসে যখন পুণ্যের পথে অগ্রসর হতে থাকব তখন যেন এ দোয়া ও করি যে, রমযানের শেষ হবার সাথেই যেন আমাদের পুণ্য বা নেকীগুলো ও শেষ না হয়ে যায়। বরং এসব পুণ্য যেন সারা জীবনের জন্য আমাদের জীবনের অংশ হয়ে থেকে যায়। আমরা যেন আল্লাহ্‌তাআলার প্রিয়জনদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারি, তাঁর ভালবাসা অর্জন করতে পারি।

আল্লাহ্‌র রহমতের দৃষ্টি যেন আমাদের উপর আপতিত হয় এবং পড়তেই থাকে। এ রমযান যেন আমাদের জন্য আমাদের জামাতের জন্য অসাধারণ সাফল্য নিয়ে আসে। আল্লাহ্ করুন যেন এমনই হয়।

(আল-ফযল লন্ডন, ২৯ অক্টোবর ২০০৪ইং)

অনুবাদ ঃ
মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী
প্রিন্সিপাল, জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশ
[পুণঃ মুদ্রিত]

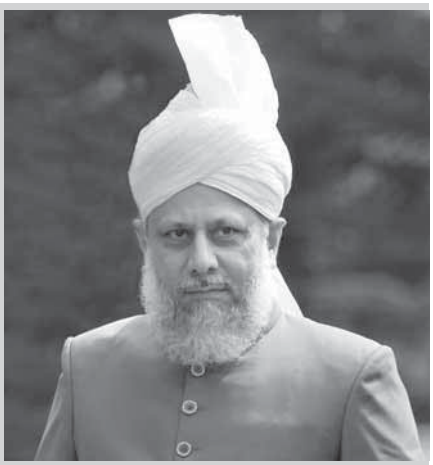

ঈদুল ফিতরের খুতবা

সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) গত ২১ সপ্টেম্বর ২০০৯ ইং তারিখে বায়তুল ফুতুহ্ লন্ডনে প্রদত্ত ঈদুল ফিতরের খুতবা

রমযানে যদি সত্যিকার তওবা করতে সক্ষম হই তাহলে রমযানের প্রতিটি দিনই আমাদের ঈদের দিন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

আধ্যাত্মিকতায় উন্নতি, আনুগত্যের মানদন্ডে উন্নতি, ধৈর্য্য সহনশীলতা, সর্বোচ্চ চারিত্রিক আদর্শের শিক্ষা, পূতঃপবিত্র পরিবর্তন, কুরআন করীম তেলাওয়াত ও খোদা তাআলার নির্দেশাবলীর উপর চলার প্রশিক্ষণ আমরা রমযানে লাভ করেছি।

আজ আমরা এগুণাবলীকে নিজেদের মাঝে চির প্রতিষ্ঠিত রাখার সংকল্পে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে ঈদ উদযাপন করছি।

তাশাহুদ, তাআউ'য ও সূরা ফাতেহা পাঠের পর হুযূর (আই.) সূরা বাকারার ২০৮ ও ২০৯নং আয়াত থেকে তেলাওয়াত করেন–

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِيْ نَفْسَهُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ
وَاللّٰهُ رَءُوْفٌ بِالْعِبَادِ ۝

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً ۪ وَ لَا
تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۭ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۝

অর্থাৎ–আর এমন মানুষও আছে, যে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য নিজেকে বিক্রি করে দেয়। আর আল্লাহ্ (এরূপ) বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত মমতাশীল। হে যারা ঈমান এনেছা! তোমরা সবাই আত্মসমর্পণের আওতায় প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

আজ আল্লাহ্ তাআলার ফজলে আমরা আরেকটি ঈদুল ফিতর উদযাপনের সৌভাগ্য লাভ করেছি। খোদা তাআলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে পুরো এক মাস তাঁর নির্দেশিত পন্থায় আমরা নিজেদেরকে ঐসব কর্মকান্ড থেকেও বিরত রেখেছি যেগুলো স্বাভাবিক অবস্থায় করতে কোন বাধা নিষেধ নেই। পরন্ত এগুলো করা সব দিক থেকেই বৈধ। আমরা নিজেদের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতা, উন্নতি, চারিত্রিক উৎকর্ষতা, কুরআন করীমকে বুঝা ও এর তেলাওয়াতের বরকতে (কল্যাণে) আশীষ মন্ডিত হওয়ার জন্য গত ২৯ দিন নিজেদের সামর্থ্যানুযায়ী চেষ্টা-প্রচেষ্টা করেছি। খোদা তাআলার সান্নিধ্য লাভের চেষ্টা করেছি। আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশাবলীকে দৃষ্টিপটে রেখে চারিত্রিক মানদন্ডকে এতোটা উন্নীত করার চেষ্টা করেছি, পুর্বের অবস্থা আর বর্তমান অবস্থার মাঝে পার্থক্য স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। অত্যন্ত দু:খ-কষ্ট ও দুরবস্থার মাঝেও সর্বোত্তম চারিত্রিক গুণাবলী প্রদর্শন করেছি। নিজ প্রভুর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে ধৈর্য ধারণ করেছি যে আর এসব কিছু আনুগত্যের সর্বোচ্চ মানদন্ড প্রতিষ্ঠা কল্পে করেছি, আর এ আনুগত্যের কারণেই আজ আমরা ঈদ উদযাপন করছি।

জান্নাতের সুসংবাদ বছরের বার মাসের মধ্যে এক মাসের আনুগত্যের কারণে নয়। বরং আজীবন আনুগত্যের দৃষ্টান্ত স্থাপকারীদের জন্য এ সুসংবাদ।

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ
اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ
وَالصّٰلِحِيْنَ ۚ وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا ۝

(সূরা নেসা : ৭০) এ আয়াতে বলা হয়েছে আনুগত্যের আবেগে খোদা তাআলার সন্তুষ্টি অনুসন্ধান ও অন্বেষণকারীদেরকে প্রতিদান হিসেবে সে জান্নাত প্রদান করা হবে তা এ জগতে

আল্লাহ্ তাআলার ইবাদত ও যিকিরের সর্বোচ্চ মনাদন্ড প্রতিষ্ঠার কারণে হৃদয়ের প্রশান্তি হিসেবে তারা পাবে। কেননা হৃদয়ের প্রশান্তি ইবাদতের মাধ্যমে লাভ হয়। বিত্তশালীরা অধিকাংশই অস্থিরতার শিকার হয়ে থাকে। ধন-সম্পদ শান্তি দিতে পারে না। ধনী লোকেরাই সবচেয়ে বেশি হৃদরোগ ও অস্থিরতার রোগে ভোগে। অতএব রোযার সময় আমরা যেসব চারিত্রিক গুণাবলী অর্জন করেছি রোযার অনুপস্থিতিতে এটাকে প্রতিষ্ঠিত রাখতে হবে। এ চেষ্টা সর্বদা অব্যাহত রাখা আবশ্যক। তাহলেই জান্নাত লাভ হবে। খোদা তাআলা বলেছেন, হৃদয়ের প্রশান্তিরূপে এ পৃথিবীতে জান্নাত প্রদান করা হয় যা পরকালে বাস্তবরূপে প্রদান করা হবে।

ঈদের দিনেও খোদা তাআলার আনুগত্যের খেয়াল রাখা আবশ্যক। পুণ্য লাভের যে চেষ্টা আমরা রমযানে করেছি তাই আজ তাকবীরের মাধ্যমে আবার বলছি, খোদা তাআলার মহান ও মহানুভবতা অনুধাবনের মাধ্যমে সর্বদা আমাদেরকে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করতে হবে। যে আল্লাহ্ তাআলার আনগত্যকারী হয়ে যাবে, তার প্রত্যেকটি দিনই ঈদ হবে। প্রকৃত ঈদের প্রকৃত অর্থ হলো পূত:পবিত্র পরিবর্তনের অঙ্গীকারের ওপর কর্ম সম্পাদন শুরু করে দেয়া। নামায প্রতিষ্ঠাকারী এবং পূত:পবিত্রতা চিরস্থায়ীভাবে অবলম্বনকারীদের জন্যই প্রকৃত ঈদ হয়ে থাকে।

আজ রমযানকে ভুলে যাওয়ার দিন নয় বরং তা স্মরণ রাখার অঙ্গীকার করতে হবে, তাহলেই আমাদের ঈদ কল্যাণময় ঈদ হবে। আমাদের রমযান কল্যাণমন্ডিত রমযান হবে। আর এ ঈদ আমাদের ইহকাল ও পরকাল সজ্জিত করার ঈদ হবে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন–"সেই দিনটি কোনটি যা জুমুআ ও দুই ঈদের দিনের চেয়ে উত্তম? তা হলো মানুষের তওবা করার দিন। কেননা ঐ দিন তার আমলনামা (কর্মলিপি) ধুয়ে পরিষ্কার করে দেয়া হয়। অতএব রমযানে যদি সত্যিকার তওবা করা হয়, সত্যিকারে চেষ্টা-প্রচেষ্টা করা হয় তাহলে আমাদের প্রতিটি দিন ঈদের দিন হবে। কেননা যে খোদার জন্য নিজের প্রাণকে বিসর্জন দিয়েছে সে কিভাব নির্দেশাবলীর (ওপর আমলকারী থেকে) বাইরে থাকতে পারে। পুতপবিত্র পরিবর্তন সাধনাকারীদের জাগতিক বিষয়াদির প্রতি লোভ থাকে না। বরং সেতো খোদার সন্তুষ্টির জন্য নিজের আত্মাকে (খোদাকে) সোপে দেয়।"

জীবিত থেকে খোদার জন্য জীবন উৎসর্গ করা হলো, চিরস্থায়ীভাবে খোদা ও বান্দার অধিকার আদায় করা। এক প্রকৃত ঈদ এটাই যখন সে তার জীবন খোদার জন্য বিক্রি করে দেয়। আল্লাহ্ তাআলার অনুকম্পায় জামা'তে এরকম লোক হাজার হাজার রয়েছেন, যারা নিজেদের আধ্যাত্মিকতাকে সাজানোর লক্ষ্যে অন্যদের আবেগ-অনুভূতির প্রতি খেয়াল রেখে ত্যাগ স্বীকার করেন। তারা গরীব ও এতীমদের প্রতি দৃষ্টি রাখেন।

হুকুকুল্লাহ্ (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অর্পিত দায়িত্ব) সম্পাদনের সাথে সাথে যখন হুকুকুল ইবাদ (অর্থাৎ বান্দার প্রতি দায়িত্ব কর্তব্য) সম্পাদন, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অর্পিত দায়িত্ব কর্তব্য পালনে মানুষকে অনুপ্রাণিত করে। এতীম, গরীব, মিসকীন ও অসহায়দের জন্য আহমদীদের হৃদয়কে আরো উন্মুক্ত করা আবশ্যক।

ইউ কে-এর আহমদীয়া ইঞ্জিনিয়ার এসোসিয়েশন আফ্রিকার এক গ্রামে বিদ্যুত ও পানি সরবরাহের খরচের দায়িত্ব নিয়েছে। এটা একটা ভাল পরিকল্পনা। যারা এমন করে খোদা তাআলা তাদের সম্পদ ও প্রাণে বরকত ঢেলে দেন। অন্যদেরকেও এই ভাল কাজে অংশ নেয়া উচিত। লাযেমী (আবশ্যকীয়) চাঁদাসমূহ আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে অর্পিত দায়িত্ব কর্তব্য পালনে খরচ হয়ে যায়। এজন্য সামথ্যবান সদস্যদের এরূপ কুরবানীতে অংশগ্রহণ করা আবশ্যক।

স্ত্রী সন্তানদের অধিকারের প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক তবে দৃষ্টিকে শুধুমাত্র তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা উচিত নয়।

ঈমানকে পরিপূর্ণ করার জন্য পরিপূর্ণ আনুগত্যের দৃষ্টান্ত দেখানো আবশ্যক। এটা সঠিক নয়, নিজের লাভ দেখলে জামা'তের ব্যবস্থার কাছে আসবো, আর নিজের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত দেখলে রাষ্ট্রীয় আদালতে যাব। শয়তান পরিপূর্ণ আনুগত্য থেকে বাধা দেয়ার জন্য অদ্ভুত অদ্ভুত পন্থা অবলম্বন করে। এজন্য খোদা তাআলার সাহায্য যাচনা করে এমন চেষ্টা অব্যাহত রাখুন যাতে শয়তান দ্বিতীয়বার চড়ে বসতে না পারে। খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের চিন্তাই প্রত্যেক আহমদীকে সর্বদা করা আবশ্যক। রমযানের আনুগত্যের বিষয়টিকে সর্বদা দৃষ্টিপটে রাখুন এবং জামা'তের ব্যবস্থাপনার সাথে আকড়ে থাকুন। এর মাঝেই সুসংবাদ নিহিত।

উদখুলু ফিস্‌সিলমে কাফ্‌ফাতান এর অর্থও এটাই, পরিপূর্ণ আনুগত্য করতে হবে। জামা'তের ব্যবস্থাপনার প্রতি পুরোপুরি আস্থা থাকা আবশ্যক। এক আহমদীকে স্মরণ রাখা আবশ্যক আমরা একটি ব্যবস্থাপনার অন্তর্ভুক্ত। ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত থাকলেই পুণ্য পুণ্য বলে সাব্যস্থ হবে। অতএব জামা'তের সাথে সম্পৃক্ত থাকা এবং জামা'তের আনুগত্য করাও পুণ্যের সাথে সম্পৃক্ত থাকা এবং অগ্রগামী হওয়ার কারণ হবে।

আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সবাইকে সৌভাগ্য দিন, আমরা যেন আনুগত্য ও নিষ্ঠার সর্বোচ্চ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করতে পারি। ঐ কর্ম যেন সম্পাদন করি যেটা আমাদেরকে খোদার সন্তুষ্টির রাস্তায় পরিচালিত করবে। যদি এমন হয়, তাহলে এটাই ঐ উদ্দেশ্য যে কারণে খোদা তাআলা মানুষ সৃষ্টি করেছেন।

সবাইকে ঈদ মোবারক। কিছু দেশে আহমদীরা এমন ভাবে ঈদ উদযাপন করছে যে তারা তা প্রকাশ করতে পারছে না। আল্লাহ্ তাআলা এমন অবস্থা সৃষ্টি করে দিন যাতে তারা আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি অনুসারে স্বাধীনভাবে ঈদ উদযাপন করতে পারে। নিজেদের দোয়ায় আল্লাহ্‌র রাস্তায় বন্দীদের, শহীদদের এবং তাদের সন্তান-সন্ততিদেস্থ অসুস্থ, আর্থিক কুরবানী দাতা, অভাবী, দূর্বল ও অসহায়দেরকে স্মরণ রাখবেন।

(আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৯-১৫ অক্টোবর ২০০৯ইং)

অনুবাদ : মওলানা শাহ মোহাম্মদ নূরুল আমীন

[পুণ:মুদ্রিত]

ওয়াকফে আরযী

সাময়িকভাবে জীবন উৎসর্গ করার অসাধারন এক ব্যবস্থাপনা

আলহাজ্জ মওলানা সালেহ্ আহমদ
মুরব্বী সিলসিলাহ

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١١﴾

অর্থাৎ তোমরাই সর্বোত্তম উম্মত, যাদেরকে মানবজাতির কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দিয়ে থাক এবং অসৎ কাজ থেকে বারণ করে থাক এবং তোমরা আল্লাহতে ঈমান রেখে থাক।

(সুরা আলে ইমরান : ১১১)

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা উম্মতে মুহাম্মাদীয়াকে সম্বোধন করে বলছেন তোমাদের কাজ হলো পৃথিবীবাসীকে সৎ কাজের নির্দেশ দিবে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকার কথা বলবে। এ এক এমন পথ, যে পথে চললে মানুষ নিজের সংশোধনের সাথে সাথে অন্যের সংশোধন করতে পারে। আহমদীয়া মুসলিম জামাত সমগ্র মানব জাতিকে হযরত নবী করীম (সা.) এর পতাকা তলে একত্রিত করার দায়িত্ব প্রাপ্ত। এ সুত্রে মানব জাতিকে সঠিক পথে আনতে হলে নিজেদের সংশোধন করে এক উত্তম আদর্শ প্রদর্শন করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। তাই কুরআনের আলোকে নিজেদের আদর্শবান করতে হলে সংশোধনের চলমান প্রক্রিয়ায় চলতে হবে। আর এর জন্য সর্বত্তোম ব্যাবস্থাপনা হলো ওয়াকফে আরযী।

অন্যান্য ইসলামী ফিরকা থেকে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের অন্যতম বৈশিষ্টগুলির মধ্য থেকে একটি হলো জীবন উৎসর্গ করার ব্যবস্থাপনা। এ পৃথিবীতে অনেক ধর্মীয় ও জাগতিক সংগঠন রয়েছে যারা নিজ উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য বহু ধরনের ত্যাগ করে থাকে। তবে যে ধরনের শ্রদ্ধা, মর্যাদা ও আত্মবিলীনতার সাথে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সদস্যরা জীবন উৎসর্গ করার ব্যবস্থাপনায় নিজেদেরকে সমর্পণ করে, এর তুলনা অন্য কোথাও পরিদৃষ্ট হয় না। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) জামাতকে উপদেশ দেন, "আমার জামাতকে তাকিদপূর্ণ নির্দেশ দিয়ে তাদের কাছে এ কথা পৌঁছে দেয়াকে আমার দায়িত্ব মনে করি যে --- কেউ যদি মুক্তি চায় এবং পবিত্র ও অনাদি জীবনের প্রত্যাশী হয় তবে সে যেন তার জীবন উৎসর্গ করে"। (মালফুযাত, প্রথম খন্ড-৩৭০পৃ)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর এ নির্দেশের আলোকে আহমদীয়া মুসলিম জামাতে জীবন ওয়াকফ করার অসাধারন ব্যাবস্থাপনা শুরু হয়। ওয়াকফ এর কয়েক ধরন রয়েছে। সবচেয়ে উত্তম ওয়াকফ হলো একজন আহমদী তার সারাটা জীবন ওয়াকফ করে যুগ ইমামের সামনে উপস্থাপন করবে। ১৯০৭ সনে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এ তাহরীকের সূচনা করেন। তখন তেরো জন সৌভাগ্যবান ব্যক্তি এ তাহরীকে লাব্বায়েক বলেন। পরবর্তীতে তাদের অনুসরনে শত শত আহমদী লাব্বায়েক বলে এ ব্যবস্থাপনায় নিজেদের উপস্থাপন করে।

ওয়াকফে আরযী তাহরীক এর উদ্দেশ্য ও সূচনা ঃ-

১৯৬৬সনের ১৮ মার্চ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) ওয়াকফে আরযী তাহরীকের ঘোষনা দেন এবং বলেন, " সময়ের সাথে সাথে অনেক জামাতে অলসতা সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের যে সংখ্যায় মুরুব্বী ও মুয়াল্লেম দরকার তা আমাদের নেই।" এ কারনে তিনি (রাহে.) জামাতকে দুই থেকে ছয় সপ্তাহের জন্য জামাতী ব্যাবস্থাপনায় ওয়াকফ করতে বলেন। এ সময়ে যাতায়াত ও খাবার খরচ নিজে বহন করবে এবং এ দিনগুলি ইবাদত, দোয়া এবং জামাতের তরবিয়ত ও সেবায় অতিবাহিত করবে।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) বলেন, **"আমি জামাতের সেসব সদস্যদের যাদেরকে আল্লাহ্ সুযোগ দিয়েছেন তাদের জন্য তাহরীক করছি তারা যেন বছরে দুই থেকে ছয় সপ্তাহের জন্য ধর্মের সেবার লক্ষ্যে ওয়াকফ করে। জামাতের ব্যবস্থাপনায় ওয়াকফকৃত সময়ে তাদেরকে যেখানে যেতে বলা হবে সেখানে তারা নিজেদের খরচে যাবে ও নিজেদের খরচ নিজেরাই বহন করবে। আর যে কাজ তাদের অর্পন করা হবে তা করতে তারা সচেষ্ট থাকবে।"** (আল ফযল-২৩মার্চ ১৯৬৬)

তিনি (রাহে.) আরো বলেন, "ওয়াকফে আরযী তাহরীকের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বন্ধুগন নিজ খরচে সদিচ্ছায় বিভিন্ন জামাতে যাবেন এবং সেখানে কুরআন শিখানো ও পড়ানোর ব্যবস্থাপনাকে আরো সংগঠিত ও উন্নত করবেন। সাংগঠনিকভাবে সেখানে জামাতের তরবিয়ত যেন এরুপ হয় যার ফলে তারা কুরআনের আদেশ নিষেধকে সানন্দে বাস্তবায়ন করবে ও গোটা পৃথিবীর জন্য আদর্শ হবে।" (আল ফযল-১৪ মে ১৯৬৯)

আল্লাহ্ তা'লা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-কে ওয়াকফে আরযীর মাধ্যমে কুরআনের জ্যোতির বিকাশ ও এ তাহরীকের সফলতার সুসংবাদ দেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) ১৯৬৬ সনের ৫ আগষ্টের খুৎবায় বলেন, "- একদিন আমার ঘুম ভাঙ্গলে নিজেকে দোয়ায় মগ্ন পেলাম, জাগ্রত অবস্থায় আমি দেখলাম যেভাবে বিদ্যুৎ চমকায় এবং পৃথিবী একাংশ থেকে আরেকাংশকে আলোকিত করে তুলে তদ্রুপ এক জ্যোতি প্রকাশিত হলো এবং তা পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তকে আচ্ছাদিত করে ফেললো। এরপর দেখলাম এ জ্যোতি একটি অংশে একীভূত হচ্ছে। অত:পর, এটি এক বাক্যের রূপ ধারন করলো।

এরপর এক ভাবগম্ভীর শব্দ বায়ুমন্ডলে প্রতিধ্বনিত হলো যা এ জ্যোতির দ্বারা সৃষ্টি হয়েছিলো। সে শব্দটি ছিলো "বুশরা লাকুম" অর্থাৎ তোমার জন্য সুসংবাদ। এ এক বড় সুসংবাদ ছিলো। যে জ্যোতিকে আমি

পৃথিবীকে আচ্ছাদিত করতে দেখেছি এবং যা পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত আলোকিত করে দিল, এর বিষয় বস্তু যেন আল্লাহ্ আমাকে বুঝিয়ে দেন, তা আমার মনোকামনা ও বাসনা ছিলো।

সুতরাং আমাদের খোদা যিনি অতীব আশীষ বর্ষনকারী ও দয়াবান তিনি নিজেই আমাকে এর তাবীর বুঝিয়ে দেন। গত সোমবার আমি জোহরের নামায পড়ছিলাম এবং তৃতীয় রাকাতের রুকু থেকে উঠে দাড়িয়েছিলাম তখন মনে হলো এক অদৃশ্য শক্তি আমাকে নিয়ন্ত্রনাধীন করে নিয়েছে তখন আমি বুঝতে পারলাম আমি যে জ্যোতি দেখেছিলাম তা কুরআনের জ্যোতি, যা তালীমুল কুরআন ও ওয়াকফে আরযীর পরিকল্পনার মাধ্যমে পৃথিবীতে ছড়ানো হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা এ পরিকল্পনায় কল্যাণ দিবেন। কুরআনের জ্যোতি ঠিক সেভাবেই সারা পৃথিবীকে আচ্ছাদিত করে ফেলবে যেভাবে আমি সেই জ্যোতিকে পৃথিবীকে আচ্ছাদিত করতে দেখেছিলাম।" (খুতবাতে নাসের প্রথম খন্ড, ৩৪৪পৃ)

কারা ওয়াকফে আরযী করবে ঃ-

হুযুর (রাহে.) জামাতের প্রত্যেক শ্রেণীর পেশাজীবিদের এ তাহরীকে অংশগ্রহন করতে বলেন। তিনি বলেন কমপক্ষে ১৫দিন খোদার জন্য জাগতিক কাজ থেকে ছুটি নিন অথবা প্রাপ্য ছুটি এ কাজে ব্যয় করুন। তিনি (রাহে.) বছরে পাঁচ হাজার ওয়াকেফীন আরযীর তাহরীক করেন। স্কুল-কলেজের শিক্ষক, প্রফেসর, ছাত্র, সরকারী চাকুরীজীবি এবং আইনজীবিদের বিশেষভাবে এ তাহরীকে অংশগ্রহন করতে বলেন। এছাড়াও মহিলাদেরও স্থানীয়ভাবে ওয়াকফে আরযী করতে বলেন। মহিলাদেরকে তাদের স্বামী, পিতা ও ভাইদের সাথে অন্য জামাতেও ওয়াকফে আরযী করার অনুমতি দিয়েছেন।

জামাতের কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের ওয়াকফে আরযী ঃ-

তিনি (রাহে.) বলেন, "জানতে পারলাম জামাতের কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের এ ভুল বুঝাবুঝি হয়েছে, তাদের ওয়াকফে আরযী

তাহরীকে অংশগ্রহন করার প্রয়োজন নেই। এদের সবাইকে ছুটি নিয়ে ওয়াকফে আরযী করে পুণ্য অর্জন করা উচিৎ।" (আল ফযল ৫ এপ্রিল ১৯৬৭)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) এর ১৭বছর খেলাফতকালে প্রায় চল্লিশ হাজার আহমদী ওয়াকফে আরযী করেন। এ তাহরীকের মূল উদ্দেশ্য হলো কুরআনের জ্যোতি দ্বারা পৃথিবীকে আলোকিত করে তোলা তাই হুযুর (রাহে.) তালীমুল কুরআন ও ওয়াকফে আরযীর জন্য পৃথক বিভাগ গঠন করেন এবং জামাতের তালীমুল কুরআন ও ওয়াকফে আরযী সেক্রেটারীকে এর তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দেন।

শুরার সদস্যদের উদ্দেশ্যে উপদেশঃ-

২০০৪ সনে অনুষ্ঠিত পাকিস্তানের মজলিসে শুরায় জামাতকে জোড়ালোভাবে এ তাহরীকের দিকে মনোযোগ আকর্ষন করে বলেন, "মজলিশে শুরার সদস্যদের কাছে আমার অনুরোধ, আপনারা সবাই এ প্রতিজ্ঞা করে যাবেন, এ বছর রাবওয়ার বাইরে থেকে আমরা পাঁচ হাজার ওয়াকেফীনে আরযী দিব। এরা সবাই দলে দলে বিভিন্ন জামাতে যাবে। এতে করে ইনশাআল্লাহ্ দলের সদস্যদের তরবিয়ত হবে এবং জামাতের তরবিয়তের ক্ষেত্রেও সাহায্য হবে'। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের এ কাজ করার তৌফিক দিন।

ওয়াকফে আরযী ও নেযামে ওসীয়্যতঃ-

"হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) বলেন, কুরআন শিখানোর জন্য ওয়াকফে আরযীর যে তাহরীক করা হয়েছে, ওসীয়্যত ব্যাবস্থাপনার সাথে এর গভীর সম্পর্ক আছে।" (আল ফযল ১০ আগষ্ট ১৯৬৬)

ওয়াকফে আরযী সম্পর্কে জামাতের দায়িত্বঃ-

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) বলেন, "হয় জামাত আমাকে এক হাজার মুরুব্বী দিবে (অর্থাৎ এক হাজার ছেলে দিবে যাদের পড়িয়ে মুরুব্বী বানানো হবে) নয়তো প্রয়োজন অনুযায়ী ওয়াকেফীনে আরযী দিবে। আপনারা যদি আমাকে ওয়াকেফীন না দেন অথবা নিজেরা এগিয়ে না আসেন তবে আল্লাহ্ তা'লা অন্য ব্যবস্থা করে দিবেন। কিন্তু আপনারা আল্লাহ্‌র আশীষ থেকে কেন বঞ্চিত হচ্ছেন।" (আল ফযল, ২ নভেম্বর ১৯৬৬)

ওয়াকফে আরযী প্রত্যেক আহমদীর ওপর ফরয ঃ-

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) বলেন, "ওয়াকফে আরযী করার প্রয়োজন অনেক। এর কারন হলো জামাতের এক বৃহদাংশ এ কথা ভুলে গেছে, তারা নিজেরাই মুরুব্বী। মুরুব্বীদের সংখ্যা যে তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে তা যথেষ্ট নয়। জামাত মনে করে ইসলাহ্ ও ইরশাদের (অর্থাৎ সংশোধন ও তবলীগ) কাজ হলো মুরুব্বীর। আসলে প্রতিটি আহমদীকেই মনোযোগ সহকারে ইসলাহ ও ইরশাদের কাজ করা প্রয়োজন। এ দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করার জন্য এবং জামাতের সদস্যদের মধ্যে ইসলাহ ও ইরশাদ সম্পর্কিত কাজ করার উদ্দীপনা সৃষ্টির লক্ষ্যে ওয়াকফে আরযীর পরিকল্পনা প্রবর্তন করেছি। এতে আধ্যাত্মিক ও দৈহিক কল্যানও রয়েছে।" (মজলিশে শুরার রিপোর্ট-১৯৬৬)

আমীরদের দায়িত্ব ঃ-

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) বলেন, "আমীরদের দৃষ্টি এ দিকে নিবদ্ধ করছি। তারা যেন জামাতের কর্মঠ ও নিষ্ঠাবান সদস্যদেরকে তাদের দায়িত্বাবলীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষন করে, যাতে করে অধিক সংখ্যায় আহমদী এ উদ্দেশ্যে (ওয়াকফে আরযী) নিজেদের সময়ের অল্প ও নগন্য এক অংশ পেশ করে'। (আল ফযল, ১৩ এপ্রিল ১৯৬৬)

ওয়াকফে আরযীতে অংশগ্রহনকারীদের ওপর ঐশী করুনার কয়েকটি ঘটনা ঃ

আল্লাহ্‌র পথে যে চলে এবং আল্লাহ্‌র জন্য যে ত্যাগ করে আল্লাহ্ তার এ পুণ্যের ফল এ পৃথিবীতেই দিতে শুরু করেন। যে ব্যক্তি ১৫দিনের জন্য জাগতিক কাজকর্ম ছেড়ে সম্পূর্ণরুপে খোদার জন্য কাজ করে, খোদাও তার জন্য নিজের রহমতের দুয়ার খুলে দেন। এক মুয়াল্লেম সাহেব লিখেন, "আমাদের এলাকার একজন বয়স্ক কৃষক ছয় সপ্তাহের জন্য ওয়াকফে আরযী করতে বের হলেন। সময়টি গমের বীজ বপন ও সেচের ছিল। তিনি বীজ বপন করেছিলেন। ওয়াকফে আরযীতে বের হওয়ার পূর্বে নিজের জমিতে দাড়িয়ে দোয়া করলেন। জমিটি বালুকাময় ছিল। বৃষ্টির পানির ওপর ফসল নিভরশীল ছিল। পরিবার বলতে লাগলো আপনি পরে যান। এখন এ

জমিতে পানি দিতে হবে। পানির সঠিক ব্যাবহার কে করবে। তখন সেই বয়স্ক কৃষক বললেন, আল্লাহ্-ই পানি দিবেন। আমরা দেখেছি যখনই পানির প্রয়োজন হতো বৃষ্টি হতো। তিনি যখন ওয়াকফে আরযী থেকে ফিরে আসলেন দেখলেন তার ফসল সবার চাইতে ভালো হয়েছে। (আল ফযল, ১৩ মার্চ ২০০৬)

সিয়েরালিওনের একজন বয়স্ক আহমদী দীর্ঘদিন যাবৎ হাটুতে ব্যাথার কারনে চেয়ারে বসে নামায পড়তেন। তিনি প্রথমবার ওয়াকফে আরযী করার জন্য আবেদন করলেন। তাকে এক দূরবর্তী গ্রামে যেতে বলা হলো। তিনি বলেন, মনে মনে ভাবলাম আমি শহর থেকে যাচ্ছি, স্থানীয়রা আশা রাখবে আমি নামায পড়াই। চিন্তিত হয়ে পড়লাম। আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করলাম, হে আল্লাহ্ তুমি অলৌকিকভাবে আমাকে আরোগ্য দাও। সন্তানদের বললাম আমি দরস দিব, কুরআন পড়াবো ও তরবীয়তের কাজ করবো। আর নামায স্থানীয়রা পড়াবে। আমি দোয়া করতে করতে ঘর থেকে বের হলাম এবং গন্তব্যে পৌঁছলাম। আল্লাহ্‌র কাছে আকুতি করছিলাম, গন্তব্যে পৌছানোর পর আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ওয়াকফে আরযী করার প্রথম কল্যাণ পেলাম। স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্টের অনুরোধে আমি সাহস করে নামায পড়ানোর জন্য দাড়ালাম এবং নামায পড়ালাম। আমি ভাবতাম বাকীটা জীবন হয়তো বসেই নামায পড়তে হবে। কিন্তু ওয়াকফে আরযী করার কল্যানে আমাকে আল্লাহ্ তাআলা সুস্থ্য করে দিলেন। আমার হাটু ব্যাথা দুর হয়ে গেলো। (আল ফযল, ২৮ অক্টোবর ২০০৫)

ওয়াকফে আরযী এক ঐশী তাহরীক। এর প্রভূত কল্যানাদী রয়েছে। এতে অংশগ্রহনকারী এক দিকে নিজের সংশোধন করার সূযোগ পায় অপর দিকে জামাতেরও সংশোধন ও তরবিয়ত করার সুযোগ ঘটে। জাগতিক কর্মকান্ড থেকে কর্তৃত হয়ে খোদার জন্য নিজেকে নিয়োজিত করার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করার প্রয়াস মানুষের জীবনকে আলোকিত করে দেয়। তাই আমাদের সবাইকে এ তাহরীকে অংশ গ্রহন করে খোদা তা'লার আশীষ অর্জনের জন্য ব্রতী হতে হবে।

ওয়াকফে আরযী করার পদ্ধতি ঃ-

১. সর্ব প্রথমে ওয়াকফে আরযী করার জন্য

আবেদন পত্র পূরন করে স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট অথবা অংগসংগঠনের প্রধান দ্বারা সত্যায়িত করে ওয়াকফে আরযী করার নুন্যতম বিশ দিন পূর্বে তালিমুল কুরআন ও ওয়াকফে আরযীর সেক্রেটারী সাহেবের কাছে প্রেরন করতে হবে।

২. কেন্দ্র কর্তৃক অনুমোদন না হওয়া পর্যন্ত ওয়াকফে আরযী করা যায় না।

৩. ফর্মে ওয়াকফে আরযী কত দিনের তা নির্দিষ্ট করে বলতে হবে।

৪. মহিলারা নিজ জামাতে ওয়াকফে আরযী করবে এবং পুরুষরা অন্য জমাতে ওয়াকফে আরযী করবে।

৫. ওয়াকফে আরযীর সময়ে নিজেকে রান্না করে খেতে হবে অথবা টাকা দিয়ে রান্না করিয়ে খাওয়া যাবে।

৬. ওয়াকফ কারীর থাকার ব্যাবস্থা স্থানীয় জামাত করবে।

৭. ওয়াকফে আরযীর সময়কার সব খরচ নিজেকে বহন করতে হবে।

৮. ওয়াকফে আরযীর মূল উদ্দেশ্য হলো কুরআন শিক্ষা।

মহিলাদের ওয়াকফে আরযী ঃ-

১. ওয়াকফে আরযী করার আবেদন পত্র পূরন করে কেন্দ্রে পাঠাতে হবে।

২. মহিলাদের জন্য ওয়াকফে আরযীর আবেদন পত্র ভিন্ন।

৩. মহিলারা শুধু স্থানীয় জামাতে ওয়াকফে আরযী করবেন।

৪. স্বামী, পিতা বা ভাইয়ের সাথে অন্য জামাতে ওয়াকফে আরযী করতে পারবেন।

৫. মহিলাদের জন্য ওয়াকফে আরযীতে মূল কাজ হলো কুরআন শিক্ষা দেয়া।

৬. স্থানীয় জামাতের বিভিন্ন বিভাগে ওয়াকফে আরযী করতে পারবে।

IT ACADEMY

৩য় তলা, ৪ বকশী বাজার রোড,ঢাকা-১২১১

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ-এর দারুত তবলীগ কমপ্লেক্সে জামাতের শিক্ষিত সদস্য/সদস্যাদের কম্পিউটার শিক্ষায় শিক্ষিত করার লক্ষ্যে একটি কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার (আই.টি একাডেমি) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। গত ৯ ডিসেম্বর ২০১১ তারিখে এটি উদ্বোধন করা হয়। উক্ত প্রতিষ্ঠানে 1. MS Office 2. Hardware Maintenance and Troubleshooting 3. Graphics Design 4. Flementary English. 5. Familiar with Office Etiquette & Manners প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষাদান করা হয়।

আমাদের বিশেষত্বঃ

- দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক মন্ডলী দ্বারা পরিচালিত
- প্রত্যেকের জন্য আলাদা কম্পিউটার
- ন্যুনতম কোর্স ফি
- মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের ব্যবহার
- সার্বক্ষনিক বিদ্যুৎ ব্যবস্থা
- প্রত্যেক ক্লাসের পূর্বে লেকচার শিট প্রদান
- ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা
- কোর্স শেষে সার্টিফিকেট প্রদান

আমাদের কোর্স সমূহঃ

1. MS Office with internet
2. Hardware Maintenance and Troubleshooting
3. Graphics Design
4. Elementary English
5. Familiar with Office Etiquette & Manners

ভর্তি নির্দেশিকাঃ

১. ন্যুনতম এস.এস.সি পাশ

২. কোর্স বাবদ প্রদেয় ঃ ভর্তি ফি -১০০,কোর্স ফি -৫০০ এবং সার্টিফিকেট ফি -১০০

বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুনঃ

মোঃ মোহাইমিনুল ইসলাম
ইন্সট্রাক্টর, আইটি একাডেমি
ইন্সট্রাক্টর, আইটি একাডেমি
মোবাইল ঃ ০১৯১৪০৪৭৬০৭
মোবাঃ ০১৯১৪০৪৭৬০৭
ই-মেইল ঃ
mibakul@yahoo.com

মোঃ ইউনুস আলী
কায়েদ, মখোআ ঢাকা
ইনচার্জ, আইটি একাডেমি
মোবাইল ঃ ০১৭২৭৭৭৬৮৮৩
ই-মেইল ঃ
mdyounus.ali@gmail.com

লাইলাতুল কদর

মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ্

লাইলাতুল কদর হচ্ছে এমন এক রাত, যে রাতে আল্লাহ্ তাআলা তাঁর সেইসব ঈমানদারের উপর তাঁর করুণা ধারা বর্ষণ করেন, যারা নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সাথে তাঁর ইচ্ছায় বিগলিত অন্তরে নিজেকে সমর্পণ করে আর তাঁর আদেশাবলী পরিপূর্ণরূপে মান্য করে। এটা এমন এক রাত যা সাধারণভাবে পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হবার সাথে সংশ্লিষ্ট, তবে এর আরও অর্থ আছে যা আল্লাহ্‌র রহমানিয়ত বৈশিষ্টের মাঝে গভীর ভাবে প্রোথিত।

পবিত্র কুরআনের সূরা আল-কাদর-এর আয়াতসমূহ দ্বারা আমাদেরকে আক্ষরিকভাবে একথা বুঝানো হয়েছে যে, 'লাইলাতুল কদর' অর্থ হচ্ছে 'ভাগ্য নির্ধারণের রাত'। এটা হচ্ছে এমন এক রাত, যা এক হাজার মাসের চাইতেও বেশী মর্যাদা সম্পন্ন (আরবীতে এক হাজার বলতে সংখ্যার দিক থেকে সর্বোচ্চ সংখ্যাকে বুঝায়)। আর এ রাতে ফিরিশ্‌তারা পৃথিবীতে অবতরণ করে এবং মানবজাতির মধ্যে এক-নব জীবনের উন্মেষ ঘটায়। পবিত্র কুরআনে অন্যত্র এক স্থান (৪৪ : ৪) থেকে আমরা একথাও জানতে পারি যে, এটা এক 'মহিমান্বিত রাত' (লাইলাতিম মুবারাকাতিন)।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) তাঁর তফসীরে কবীরে লিখেন, "সেইরাতে ফিরিশ্‌তাগণ ও পবিত্রাত্মা অবতরণ করেন"। এ দ্বারা একথা বুঝায় যে, "আল্লাহ্‌র ফিরিশ্‌তাগণ প্রত্যেক ধর্মীয় প্রয়োজনাদী মেটাতে এবং নূতন প্রেরিত বার্তার প্রসার এবং প্রচারের পথে সব অন্তরায় দূর করতে অবতরণ করে (তফসির কবীর, পৃঃ ২৮৫৯)।

সূরা আল কাদ্‌র প্রসঙ্গে আমরা আরো দেখতে পাই, আল্লাহ্ তাআলা সেই মহিমান্বিত রাতের কথা উল্লেখ করেছেন, যে রাতে হযরত খাতামুল আম্বিয়া (সা.)-এর উপর পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছিল এবং তিনি (সা.) সেইসব মহিমান্বিত আয়াতসমূহ পাঠ করেছিলেন যেগুলো চিরকাল সব মু'মিনের অন্তরে গ্রথিত হয়ে থাকবে।

পড় তোমার প্রভু প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন

তিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে এক আঠালো রক্তপিন্ড থেকে

তুমি পড়, কেননা তোমার প্রভু-প্রতিপালক পরম সম্মানিত।

যিনি কলমের মাধ্যমে শিখিয়েছেন

তিনি মানুষকে তা শিখিয়েছেন–যা সে নিজে জানতো না (৯৬ :২-৬)

এ প্রসঙ্গে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) ব্যাখ্যা দান করেছেন যে 'এক হাজার মাস' শব্দগুলোর অনেক অর্থ রয়েছে, তার মধ্যে দু'টি অর্থ হচ্ছে : (১) যেহেতু 'লাইলাতুল কদর' হচ্ছে অসংখ্য রাত, এ দ্বারা এটা বুঝায় যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর যুগ অন্য সব যুগের সমাহার অপেক্ষা অধিক মহান; (২) পবিত্র কুরআনের মর্ম ও তত্ত্বগত মানের সমৃদ্ধতা জগতের সব জ্ঞানী মানুষের সম্মিলিত গবেষণা ও প্রচেষ্টা দ্বারা প্রাপ্তমূল্য অপেক্ষাও অধিকতর মূল্যবান।

'লাইলাতুল কদর' এর আরেকটি ব্যাপক অর্থ রয়েছে যদ্বারা এটাও বুঝায় যে, মানব জাতি যখন অন্ধকারে নিপতিত হয় এবং সংস্কারের প্রয়োজন বোধ করে, তখন আল্লাহ্ তাআলা নূতন একজন সংস্কারক প্রেরণ করে তাদের ডাকে সাড়া দেন। এজন্যে এক হাজার মাস আনুমানিক এক শতাব্দীর সমান হয়ে থাকে, যে বিষয়ে মহানবী (সা.) এর কথা, 'অবশ্যই আল্লাহ্ প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে এ উম্মতের মধ্যে একজন মুজাদ্দিদ প্রেরণ করবেন, যিনি ধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করবেন' (আবুদাউদ, কিতাবুল ফিতান)।

পবিত্র কুরআনে আর-রাহীম –অর্থাৎ 'বার বার কৃপাকারী' বলে বর্ণনা করা হয়েছে এবং এ আয়াত দ্বারা আল্লাহ্‌কে অশেষ করুণার আধার হিসেবে প্রকাশ করা হয়েছে আর এ আয়াতে মানবজাতির অস্তিত্বকে সংরক্ষণ করার একটি ব্যবস্থাপত্র রয়েছে। বিষয়টি অধিক বিস্তৃত করে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) লিখেন,

ইন্না আনযালনাহু ফি লাইলাতুল কাদ্‌রে

"সাধারণ অনুবাদ করা হলে এর অর্থ হচ্ছে 'এই রাত এক মহিমান্বিত রাত', কিন্তু পবিত্র কুরআনের কতিপয় আয়াত এ ইঙ্গিত দেয় যে, বিশ্বের অন্ধকারময় অবস্থাও এর লুক্কায়িত গুণরাজির কারণে এটি ভাগ্য নির্ধারণকারী এক রাত। অন্ধকারের ঐ অবস্থায় আল্লাহ্‌র কাছে আন্তরিকতা এবং স্থিরসংকল্পতা, ধার্মিকতা এবং প্রার্থনা, এসবের বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। অন্ধকারের সেই মাত্রা, যা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আবির্ভাবের সময় সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছেছিল এবং এক পরম জ্যোতি অবতরণের দাবী পেশ করছিল, সেই অন্ধকারপূর্ণ অবস্থা লক্ষ্য করে তমসাচ্ছন্ন সৃষ্টজীবের উপর করুণা করতে রহমানিয়ত-এর গুণ তরঙ্গায়িত হয়ে স্ফীত হলো এবং স্বর্গীয় আশীর্বাদ ধরাপৃষ্ঠে অবতরণ করলো।

ঐ তমসাচ্ছন্ন অবস্থা তখন বিশ্বের জন্যে আশীর্বাদ হয়ে দাঁড়াল এবং তা দ্বারা বিশ্ব এক বিশাল কৃপার অধিকারী হলো, যাতে 'পূর্ণমানব' এবং নবীগণের সর্দার, যার সমতুল্য কেউ নেই আর ভবিষ্যতে আর কেউ হবেও না, সারা বিশ্বের হেদায়াতের জন্যে আসলেন এবং বিশ্বের জন্যে সেই

উজ্জ্বল কিতাব আনলেন, যার সাদৃশ্য কোন কিতাব বা কোন চক্ষু কখনো অবলোকন করেনি। এটা ছিল সেই হতাশা ও অন্ধকারময় যুগে খোদার আধ্যাত্মিক পূর্ণতার এক মহান বিকাশ, খোদা প্রেরণ করলেন এক পরম দ্যুতি, যার নাম 'ফুরকান' এবং যা সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করে এবং যা সত্যের আগমন এবং মিথ্যার তিরোধানকে ব্যবহারিকভাবে প্রদর্শন করে। এটা সে সময় পৃথিবীতে অবতরণ করেছে পৃথিবী যখন আধ্যাত্মিকভাবে মরে গিয়েছিল এবং স্থলভাগ ও সমুদ্র উভয়ই চরমভাবে দূষিত হয়ে পড়েছিল। এর অবতরণে সেই কাজ সাধিত হয়েছিল, যে বিষয়ে সর্বশক্তিমান খোদার উক্তি হচ্ছে :–

এ'লামু আন্নাল্লাহা ইউহ্ ইয়েল আরদে বাঅ'দে মাওতেহা অর্থাৎ জমিন মরে গিয়েছিল এবং খোদা একে নূতনভাবে পুনর্জীবিত করেছেন। স্মরণ রাখা উচিত যে, জমিনকে পুনর্জীবিত করার জন্যে রহমানিয়াত গুণ তরঙ্গায়িত হবার মাধ্যমে জগতে পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হয়েছিল। এটা সেই গুণ, যা সময়ে সময়ে বস্থগতভাবে নিজকে প্রকাশ করে এবং শুষ্কভূমির উপর কৃপাবারি বর্ষণ করে দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িতদের জন্যে খাদ্যের জোগান দেয়। সময়ে সময়ে এই একই গুণ আধ্যাত্মিকভাবে তরঙ্গায়িত ও স্ফীত হয়ে ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্তদের, যারা ভুল ও পাপের পথে চলার কারণে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেছে এবং সত্যতা ও খোদাভীরুতার পরিচর্যা থেকে বঞ্চিত হয়েছে, যা আধ্যাত্মিক জীবনের উৎস, তাদের উপর কৃপা বর্ষণ করে। এভাবে সেই সদয় সত্তা, যিনি প্রয়োজনের সময়-মানবদেহের পরিচর্যা করে ক্রমোন্নতি দান করে থাকেন, একইভাবে তিনি প্রয়োজনের সময়-আধ্যাত্মিক পরিচর্যাও প্রদান করে থাকেন"। (বারাহীনে আহমদীয়া, রূহানী খাযায়েন, খন্ড-১ পৃ: ৪১৪-৪৩৫)

পৃথিবীতে সংস্কারক প্রেরণের চূড়ান্ত ফলাফল এটাই হয়ে থাকে যে, বিশ্ব এক শান্তির যুগে প্রবেশ করে, যার কথা পরোক্ষভাবে সূরা আল কাদ্‌রের শেষ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) সেটাকে এভাবে ব্যাখ্যা করেন : "সালাম' বা 'শান্তি' শব্দটি এক পূর্ণার্থক বাক্য, যার অর্থ হচ্ছে 'এক অনাবিল শান্তি'। নবী অথবা স্বর্গীয় সংস্কারকের আবির্ভাবের সময় মানব-হৃদয়ে মমতার এক অসামান্য মানসিক শক্তি অশেষ দু:খ-কষ্ট এবং অভাব-অভিযোগের মধ্যেও মু'মিনদের উপর-অবতরণ করে। এতে মু'মিনদের হৃদয়ে সে সময় স্বর্গীয় যে প্রশান্তি সঞ্চারিত হয় তা বস্থজগতের সমুদয় ইন্দ্রীয়গত উল্লাসকে ছাড়িয়ে আরো সম্মুখ পানে ছুটে চলে।

হিইয়া হাত্তা মাত্‌লাইল ফাজরে–বাক্যের অর্থ হচ্ছে, 'এ অবস্থা ভোর পর্যন্ত বিরাজ করে'–এর দ্বারা কষ্টের রাতের অতিক্রমণ এবং সত্যের প্রাধান্য ও কর্তৃত্ব লাভের প্রত্যুষ কালের উদয়কে বুঝায়' (তফসীর কবির, পৃ: ২৮৬০)।

প্রত্যেক মু'মিন বান্দার জন্যে 'লাইলাতুল কদর'-এর আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থ রয়েছে, আর তা হলো, এটা এমন এক রাত, যখন মু'মিন এক মহান আশীর্বাদ লাভ করতে পারে। প্রসিদ্ধ একটি হাদীস দ্বারা একথা সাব্যস্ত যে, মহানবী (সা.) বলেছেন, 'কদরের রাতে যে ব্যক্তি ঐকান্তিক বিশ্বাসের সাথে আল্লাহ্‌র পুরস্কার লাভের আশা করে, তার অতীতের সব গুণাহ্ ক্ষমা করে দেয়া হয়'। (বুখারী শরীফ, খন্ড-১)।

অপর এক হাদীসে মহানবী (সা.) লাইলাতুল কদর অন্বেষণের সময় কখন হবে সে বিষয়ে উপদেশ দিয়ে বলেন, 'রমযান মাসের শেষ দশ দিনের বেজোড় রাতগুলোতে লাইলাতুল কদর অন্বেষণ কর' (বুখারী শরীফ, খন্ড-৩)।

জানা যায়, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, রমযান মাসের ২৭ তারিখের রাত যদি শুক্রবার হয়, তাহলে আল্লাহ্‌র রহমতে ঐ রাত লাইলাতুল কদর হতে পারে।

উপরোক্ত বিশ্লেষণের আলোকে প্রত্যেক মু'মিন নর-নারীর এটা দায়িত্ব যে, রমযানের শেষ দশ দিন সে তার ইবাদত বাড়িয়ে দেবে এবং ঐকান্তিভাবে দোয়া করবে যে তারা যেন লাইলাতুল কদরের সুফল থেকে উপকৃত হয় এবং আল্লাহ্‌র রহমতে তাদের অতীতের সব গুনাহ্ মাফ পেয়ে যায়।

লাইলাতুল কদর বিষয়ে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) ১৪ নভেম্বর ২০০৩ তাঁর প্রদত্ত খুৎবায় বলেন, প্রত্যেক মু'মিন শুধুমাত্র রমযানের শেষ দশ দিনের ইবাদতের উপরই যেন জোর না দেন বরং রমযানের প্রত্যেক রাতের ইবাদতের উপরই যেন গুরুত্ব আরোপ করেন। হুযূর (আই.) বলেন, লাইলাতুল কদরের রাত কোনটি, এ বিষয়ে অনিশ্চয়তার পেছনে, কারণ এটাই হতে পারে যেন এ বিষয়টি নিশ্চিত করা যায় যে, মু'মিনগণ যেন কেবল শেষ দশটি রাতই আল্লাহ্‌র ইবাদতে নিমগ্ন না থাকে বা নির্ধারিত একটি রাতের ইবাদতের আনুষ্ঠানিকতাই শুধুমাত্র পালন না করে।

এ বিষয়ে অধিকতর বিশ্লেষণ প্রদান করে হুযূর (আই.) বলেন, 'মহানবী (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি সারা রমযান মাসের সব নামায বা'জামাত আদায় করে, সে ব্যক্তি লাইলাতুল কদর-এক বৃহদাংশ সংগ্রহ করে। লাইলাতুল কদরের অভিজ্ঞতা লাভের জন্য একজন মানুষকে সারা মাস জুড়ে ন্যায়পরায়নতার সর্বোচ্চ মান সংরক্ষণ করে আল্লাহ্ ও তাঁর বান্দার হক্ আদায় করতে হবে। আর এর মধ্যেই লাইলাতুল কদর লাভের মর্মার্থ নিহিত।

হুযূর (আই.) এ কথার ব্যাখ্যা দান করে বলেন, যদিও কতিপয় হাদীসে লাইলাতুল কদর-এ আলোর ঝলক প্রকাশের মত নিদর্শন দেখার বর্ণনা আছে, তবুও লাইলাতুল কদরের এরূপ চিহ্ন দেখা বাধ্যতামূলক নয়। বাস্তবে মহানবী (সা.) রমযানের শুরু থেকেই শেষ দশ দিনের এই দিনগুলোতে আল্লাহ্‌র সর্বোচ্চ এবং পরমোৎকৃষ্ট বৈশিষ্ট সম্পন্ন ইবাদতের মাঝে অতিবাহিত করার অপরিমেয় সংকল্প করতেন। এসব দিনে উচ্ছসিত ভাবে আল্লাহ্‌র স্মরণে রত হতে, তাঁর মহত্ত্ব প্রচারে মহিমাগীতি করতে তিনি আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন।

এ প্রচেষ্টায় সহযোগিতা পেতে লাইলাতুল কদরে আমাদেরকে নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করতে বলা হয়েছে, যা খাতামাল আম্বিয়া (সা.) হযরত আয়েশা (রা.) কে জানিয়েছেন :

আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুউন তুহিব্বুল আফওয়া ফা আফু আন্নি

অর্থাৎ-হে আল্লাহ্, তুমি পরম ক্ষমাকারী, ক্ষমা করা তুমি পছন্দ কর, অতএব তুমি আমায় ক্ষমা কর। (ইবনে মাজা, কিতাবুদ্‌দোয়া)

আমরা সবাই, পবিত্র এ মাসে ঐকান্তিক দোয়ায় নিয়োজিত হয়ে, আল্লাহ্‌র কৃপা লাভে সমর্থ হবো ইনশাআল্লাহ্, আমীন।

রোযা পালনে রুগ্ন ও মুসাফিরের ব্যাপারে ইসলামী শিক্ষা

মওলানা জাফর আহমদ

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তাআলা বলেন, কিন্তু তোমাদের মধ্যে যদি কেহ পীড়িত হয় অথবা সফরে থাকে, তাহা হইলে তাহাকে অন্য সময়ে এই সংখ্যা পূর্ণ করিতে হইবে। এবং যাহাদের পক্ষে ইহা (রোযা রাখা) ক্ষমতাতীত, তাহাদের উপর ফিদিয়া (এক মিসকিনকে আহার্য দান করা) (বাকারা : ১৮৫)।

এ আয়াতে মহান আল্লাহ্ তাআলা যারা অসুস্থ, শারীরিকভাবে অনেক-বেশী দূর্বল ও মুসাফির তাদের অন্য সময় রমযানের ফরয রোযা রাখার নির্দেশ প্রদান করেছেন। মোটকথা, এ তিন ধরনের ব্যক্তিগণ রমযান মাসে রোযা রাখা থেকে বিরত থাকবে। তবে হ্যাঁ যখন সে সুস্থ্য হবে বা তার সফর সমাপ্ত হয়ে যাবে তখন সে অবশ্যই রোযা রাখবে।

এ ব্যাপারে হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেন, আল্লাহ্ তাআলা মুসাফিরের জন্য অর্ধেক নামায ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং গর্ভবতী ও যারা বাচ্চাকে দুধ পান করান, তাদেরকে রোযা থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন। (তিরমিযী)

ইসলামী শিক্ষায় সুযোগ ও সহজের প্রতি দৃষ্টি দেয়া হয়েছে। এ-কারণে রোযার নির্দেশের মাঝে দুর্বল ব্যক্তি, মুসাফির ও অসুস্থদেরকে এ-অবকাশ দেয়া হয়েছে যে, রমযানের পরে যখন সে রোযা রাখার সামর্থ্য লাভ করবে, সে যেন তখন রোযা রাখে। কিন্তু রমযানে রোযা রাখতে না পারার কারণের অপূর্ণতা সে যেন ফিদিয়া দ্বারা সম্পূর্ণ করে, যা একটি রোযার জন্য এক মিসকিনের খাবার পরিমাণ আহার্য।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) রোযা না রাখতে পারা অসুস্থ ব্যক্তিদের জন্য অত্যন্ত উত্তম দোয়া শিখিয়েছেন, যা তার উত্তরণের মাধ্যম হতে পারে।

তিনি (আ.) বলেন, "একদা আমার হৃদয়ে এ-ধারনার সৃষ্টি হল যে, ফিদিয়া কেন নির্ধারণ করা হয়েছে। তো জানতে পারলাম, সামর্থ্য লাভের উদ্দেশ্যে। যেন এটার মাধ্যমে রোযার সামর্থ্য লাভ হয়। আল্লাহ্ তাআলার সত্ত্বাই তো শক্তি সামর্থ্য দান করেন। আর প্রতিটি বিষয় খোদা তাআলার নিকটেই চাওয়া উচিত। আল্লাহ্ তাআলা তো সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। যদি তিনি চান, তাহলে একজন দুর্বল থেকে দুর্বলতর ব্যক্তিকেও রোযা রাখার সামর্থ্য দান করতে পারেন। সুতরাং ফিদিয়ার উদ্দেশ্য এটাই, সে যেন রোযা রাখার সামর্থ্য লাভ করতে পারে। এটা কেবল খোদার ফজল দ্বারাই হয়ে থাকে। আমার নিকট এটা অত্যন্ত জরুরী যে, মানুষ যেন এই দোয়া করে।

'হে আমার প্রভু! এটা তোমার একটি বরকতমন্ডিত মাস, আর আমি এ থেকে বঞ্চিত থেকে যাচ্ছি। জানিনা আগামী বছর জীবিত থাকব কি-না। অথবা এই থেকে-যাওয়া রোযা আদায় করতে পারব কি-না। যদি কেউ খোদার কাছে এভাবে শক্তি সামর্থ যাচ্না করে, তাহলে আল্লাহ্ অবশ্যই তাকে শক্তি সামর্থ্য দান করবেন। (মালফুযাত, ৪র্থ খন্ড)

অসুস্থ বা দুর্বল ব্যক্তি ফিদিয়া প্রদানের পর যদি রোযা রাখার প্রতিবন্ধকতা দূরীভূত হয়ে যায়, তাহলে যেন সে রোযা রাখে। কেননা ফিদিয়া দেয়ার মাধ্যমে রোযার হক আদায় হয়ে যায় না। যদি দুই-তিন বছর পরও শরীর সুস্থ হয়ে যায়, তাহলে সামর্থ্য অনুযায়ী রোযা রাখতে হবে। (আল ফজল, ১৯৪৫)

ফিদিয়ার ব্যাপারে কুরআনের নির্দেশ হচ্ছে, মিন আওসাতে মা তুতয়েমুনা আহ্লীকুম- অর্থাৎ নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী খাবার খাওয়ানো উচিত। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এটার পরিমাণ অর্ধেক ছা গমের মাধ্যমে করেছেন। অর্থাৎ প্রায় পৌনে দুই কেজি গম, এটি ছুটে-যাওয়া একটি রোযার ফিদিয়া হবে। অর্থাৎ দুই বেলা খাবারের সমপরিমাণ। অত:পর ফিদিয়া সেই ব্যক্তির উপর আবশ্যক, যে সামর্থ্য রাখে। আর অপারগ-ব্যক্তির জন্য অনুতপ্ততা, তওবা, ইস্তেগফার, যিক্‌রে ইলাহী ও ধর্মের সেবাই এই ঘাটতিকে পূর্ণ করবে।

দুর্বলদের তালিকায় মুসাফির, অসুস্থ্য, একেবারে বৃদ্ধ, গর্ভবতী মহিলা ও দুধ-দানকারী মহিলা এর অন্তর্ভুক্ত। এখানে অসুস্থ, গর্ভবতী, ও ঋতুবতী-মহিলার কথা বর্ণনা করেছি। হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, আঁ হযরত (সা.) গর্ভবতী মহিলাকে যার শরীর খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং দুধ দান কারী মহিলাকে, অর্থাৎ যার সন্তানের স্বাস্থ্যহানীর সম্ভাবনা রয়েছে তাদেরকে রোযা থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। (ইবনে মাজাহ)।

এটার অর্থ হচ্ছে, তারা যেন রমযানের পরে রোযা রেখে নেয় এবং সামর্থ্য থাকলে যেন ফিদিয়াও আদায় করে দেয়। আর এটা সেই বিষয়ের কাফ্‌ফারা হবে যে, সে রমযানের মত বরকত-মন্ডিত মাসে রোযা রাখতে পারেনি। হ্যাঁ, যদি ফিদিয়া আদায় করার সামর্থ্য না থাকে, তাহলে পরবর্তীতে রোযা রাখাই যথেষ্ট।

যদি স্থোর সৃকিান মহিলার এই অবার সৃষ্টি হতে থাকে যে, এস্থর অসুস্থ তো পরের বার গর্ভবতী, তাহলে তার রোযা মাফ এবং কেবল ফিদিয়াই যথেষ্ট। অনুরূপভাবে অতিবৃদ্ধ ও চিররুগ্নদের জন্যও একই নির্দেশ। এভাবে ভবিষ্যতে কখনো যার রোযা রাখার কোন সম্ভাবনা নাই, তাহলে তাদের জন্যও একই নির্দেশ, অর্থাৎ তারা

কেবল ফিদিয়া আদায় করে দিবে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন, যে ব্যক্তি আমাদের জন্য চেষ্টা-প্রচেষ্টা করবে, তাকেই হেদায়াত দেয়া হবে।

এ ব্যাপারে দেখা যায়, কতিপয় লোক কট্টর, কঠোরতা ও অবজ্ঞা দেখায়। অনেকে তো এ রকম রয়েছে, কোন রোগ বা কারণ ছাড়াই ফরজ রোযা ছেড়ে দেয় আবার অনেক লোক প্রস্থেক অসুস্থ্য, বৃদ্ধ, শিশু ও গর্ভবতীদের এবং দুধ দানকারীদের ব্যাপারেও আশা করে, যেন তারা রোযা রাখে। এ দু'টোর কোনটাই সঠিক নয়। কেননা, ইসলামী-শিক্ষায় কোথাও জোর-জবরদস্তি নাই আবার যেখানে ছাড় দেয়া হয়েছে, সেটার ওপর আমল করাও জরুরী।

সফরে রোযা রাখার ব্যাপারে আঁ হযরত (সা.) বলেন, হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.) বর্ণিত হয়েছে যে, আঁ হযরত (সা.) এক সফরে ছিলেন। রাস্তায় তিনি সাহাবাদের একটি বড় সমাগম দেখতে পান, যাতে এক ব্যক্তির উপর ছায়া দেয়া হচ্ছিল। হুযূর (সা.) জিজ্ঞেস করলেন কি ব্যাপার? (সাহাবা রা.) নিবেদন করল একজন রোযাদার। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, 'সফরে রোযা রাখায় কোন নেকী নেই'। (বুখারী)

যখন রোযা ফরজ হল, তো প্রাথমিক-যুগে রসূল (সা.) সাহাবাগণকে সফরে রোযা রাখতে নিষেধ করেন নি। বরং স্বাধীনতা দিয়েছেন, যে চায় বা সামর্থ্য রাখে, সে যেন রোযা রাখে স্বয়ং হুযূর (সা.) এর আমল ও প্রাথামিক-যুগে এরূপ ছিল। কখনো কস্থি পরিস্থিতিতেও রোযা রাখতেন। আর তাকে দেখে কতিপয় সাহাবীও রোযা রাখত। (আবু দাউদ কিতাবুস সওম)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) এর একটি বর্ণনা হচ্ছে, প্রাথমিক যুগে আমরা রসূল করীম (সা.)-এর সাথে এক যুদ্ধে ছিলাম। রমযান মাস ছিল। আমাদের মধ্যে অনেকেই রোযা রাখত, আবার অনেকে রাখত না। কিন্তু তখন সফরে রোযা রাখা বা না রাখাকে কোন দোষের মনে করা হতো না। বরং আমরা এটা বলতাম, যার শক্তি সামর্থ্য আছে, সে যদি সফরে রোযা রাখে, তো ভাল। আর যদি কারো শক্তি সামর্থ না থাকে, তা হলে সে রোযা না রাখলে কোন অসুবিধা নাই। (মুসলিম, তিরমীযি কিতাবুস সওম)

জানা যায়, সেই যুগে রোযার ব্যাপারে নির্দেশ আসার পরও সফরে রোযা না রাখার অবকাশকে একটি সুযোগ মনে করে কতিপয় সাহাবী কল্যাণ লাভ করার চেষ্টা করত। আবার অনেকে তা করত না হযরত (সা.) কোন কঠোরতা দেখান নি। সুতরাং একজন সাহাবী হামজা বিন ওমর আসলামা (রা.) হযরত মুহাম্মদ (সা.)কে বলেন, আমার সফরে রোযা রাখার শক্তি আছে। আমি রোযা রাখলে পাপ হবে না তো? হুযূর (সা.) বলেন, এটা তো আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে একটি সুযোগ। এটাকে গ্রহণ করা অতি উত্তম। যদি কেউ রোযা রাখে, তা হলে পাপ হবে না। (মুসলীম)

কিন্তু এরপরও আঁ হযরত (সা.) জন সাধারণকে সফরে রোযা রাখার ব্যাপারে উৎসাহিত করেন নি। কোন এক সফরে সাহাবা (রা.)গণ রাসূল করীম (সা.) এর সাথে ছিলেন। কতিপয় সাহাবী রোযা ছিলেন। যখন তাবু খাটানোর কাজ আরম্ভ হল, তো রোযাদারেরা শক্তি হারিয়ে বসে, পরে কান্ত-শ্রান্ত হয়ে কাজ ছেড়ে দেয়। কিন্তু যারা রোযা রাখেন নি, তারা তার তাবু-খাটানো ও অন্যান্য কাজে কঠোর পরিশ্রম করে। সেই সময় হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেন, আজকে যারা রোযা রাখেনি, তারা রোযাদারদের তুলনায় নেকী ও ছওয়াবে অগ্রগামী হয়েছে। (বুখারী, মুসলীম কিতাবুস সওম)

কিন্তু কিছু কাল পরে হুযূর (সা.) যখন দেখলেন, সাহাবাগণ আল্লাহ্ তাআলার ছাড় দেওয়াকে কেবল একটি সুযোগ হিসাবে ব্যবহার করছে, বরং সফরে রোযা রাখা বাদ দিচ্ছে না, এমন-কি নিজের জীবনের উপর যুলুম করে রোযা রাখছে তো তিনি (সা.) কঠোরভাবে সফরে রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন। সুতরাং মক্কা বিজয়ের ৮ম বছরে আঁ-হযরত (সা.) রমযান মাসে মক্কা সফর করেন, সেই সফরের শুরুতে তিনি (সা.) ও তাঁর সাহাবীগণ রোযা রাখতেন। যখন আসফাস্থনামক স্থানে পৌঁছান, যা মক্কার একেবারে নিস্থট অবস্থিত, তো হুযূর (সা.) এর নিকট আবেদন করা হয়, হুযুরের রোযা রাখার কারণে তাঁর ভালবাসায় কতিপয় সাহাবী খুব কষ্ট করে রোযা রাখছেন। রহমাতুল্লিল আলামীন তৎক্ষণাৎ পানি আনান এবং সকলের সামনে পানি পান করে রোযা ছাড়েন। এটা খুব সম্ভব আসরের পরের ঘটনা ছিল। কতিপয় সাহাবী তখনই রোযা খুলেন, কিন্তু অনেক সাহাবী মনে করেছে, সূর্য অস্ত যাওয়ার অল্প সময় বাকী আছে, আর আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করতে পারব, তাই তারা রোযা ভাঙ্গেনি। যখন হুযূর (সা.) তা জানতে পারলেন, তো তিনি (সা.) বলেন, ওলাইকাল ওসাতু অর্থাৎ-এ সকল লোকেরা অবাধ্য (তিরমিযী আবওয়াবুস সওম)।

ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন, হুযূর (সা.) মক্কা বিজয়ের সফরে গাদীস্থনামক স্থান পর্যন্ত রোযা রাখতেন। এরপর আর সফরে রোযা রাখেন নি। সাহাবীগণের এ-রীতি ছিল, তারা রাসূল করীম (সা.) এর জীবনের শেষ দিকের আমলের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকত। ইমাম যুহুরী বলেন, সফরে রোযা রাখার ব্যাপারে তাঁর (সা.) সুন্নত হচ্ছে রোযা না রাখা। আর সাহাবীগণও তাঁর (সা.) জীবনের শেষ আমলকে বেশী প্রাধান্য দিতেন এবং যথার্থ মনে করতেন। (মুসলীম, কিতাবুস সওম)

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী (আ.) এ ব্যাপারে বলেন, যে ব্যক্তি মুসাফিস্থও অসুস্থ অবস্থায় রমযান মাসে রোযা রাখে, সে খোদা তাআলার নির্দেশের স্পষ্ট অবাধ্যতা করে। খোদা তাআলা পরিষ্কার বলে দিয়েছেন যে, মুসাফির স্থং অসুস্থ ব্যক্তি যেন রোযা না রাখে।স্থরং সুস্থ্য এবং সফর সমাপ্ত হওয়ার পর যেন রোযা রাখে। খোদার এ নির্দেশের উপর আমল করা উচিত। কেননা, মুক্তি তো হবে আল্লাহ্‌র ফজলের মাধ্যমে, কেউ নিজের আমলের জোরে মুক্তি লাভ করবে না। খোদা তাআলা এটা বলেননি স্থ, অসুস্থ, কম হোক বা বেশী, সফর ছোট হোক অথবা দীর্ঘ, বরং সাধারণভাবে নির্দেশ দিয়েছেন। আর এর উপর আমল করা উচিত। যদি মুসাফিস্থও অসুস্থ্য-ব্যক্তি রোযা রাখে তাহলে খোদার নির্দেশ অমান্য করার দোষে সে দোষী সাব্যস্ত হবে। (বদর ১৭ অক্টোবর ১৯০৭)

সুতরাং কুরআন করীম, হাদীসে নববী (সা.) এবং এ-যুগের 'হাকামান আদালানের' বর্ণনা ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ পর্যালোচনা করলে স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, সফস্থও অসস্থ্য-অবস্থায় কোন রোযা নাই। যদি কেউ মনে করে, গায়ের জোরে রোযা পালন করবে, তাহলে তার মনে রাখা উচিত, এরূপ রোযা পালনে কোন নেকী নেই-ই বরং তা আল্লাহ্ তাআলার নিষেধের পরিপন্থী কাজ। কুরআনের নির্দেশ পালনের বা আনুগত্য করার মাধ্যমেই কেবল আমরা খোদার প্রকৃত সন্তুষ্টি লাভ করতে পারি।

রোযা দৈহিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশ ঘটায়

মাহমুদ আহমদ সুমন

রোযা-পালন সম্পর্কে যেমন রয়েছে মহান আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশ, অন্যদিকে রয়েছে অসংখ্য পার্থিব-কল্যাণ। যেভাবে হাদীসে উল্লেখ আছে 'তোমরা রোযা রাখ, তাহলে সুস্থ্য থাকতে পারবে।' এছাড়াও রোযা যে মানব জাতির রোগমুক্তির কারণ, তা বহু হাদীসে প্রমাণিত আর আজ চিকিৎসাবিজ্ঞানও রোযার অপরিহার্যতা স্বীকার করে।

আমরা জানি, মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, তার দৈহিক গঠন-প্রকৃতি ও স্থিতিশীলতায় অবদান রাখে সত্য, কিন্তু এই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোর কাজের একটা সীমাবদ্ধতা আছে। যেমন সীমাবদ্ধতা আছে মানুষের দৈহিক কাজকর্মে। উদাহরণস্বরূপ, কোন মানুষ যখন অনেক সময় পর্যন্ত কাজ করতে থাকে, তখন সে কান্ত হয়ে পড়ে। সে যদি পর্যাপ্ত পরিমাণে বিশ্রাম নিতে পারে, তাহলে আবার কাজে উৎসাহ-উদ্দীপনা ও সতেজতা ফিরে পায়। ঠিক তেমনিভাবে মানুষের অভ্যন্তরীণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ; যেমন : জিহ্বা, লালাগ্রন্থি, হৃৎপিণ্ড, কিডনি, পাকস্থলী, কোষ, লিভার, মূত্রথলি, প্রভৃতিরও কাজের একটা নির্দিষ্ট প্রকৃতি, পরিমাণ ও সীমাবদ্ধতা আছে। অর্থাৎ মানুষ যখন সকাল-বিকালের নাস্তাসহ দুপুর ও রাতে খাবার খায়, তখন স্বভাবতই সর্বাবস্থায় তার উদর পূর্ণ থাকে বা উদরে খাদ্যকণা অবস্থান করে থাকে। আর এই খাদ্যকণাগুলোকে হজম করার জন্য মানবদেহের অভ্যন্তরীণ সামান্য লালাগ্রন্থি থেকে শুরু করে পাকস্থলী পর্যন্ত অনবরত কাজ করে থাকে। এমনকি পেটে যদি একটি সরিষা পরিমাণ খাদ্যকণাও অবশিষ্ট থাকে, তাহলেও এই সামান্য খাদ্যকণাকে হজম করার জন্য অভ্যন্তরীণ সবকিছুই একসঙ্গে কাজে লেগে যায়। ফলে এগুলো কখনও ন্যূনতম বিশ্রামের সুযোগও পায় না এবং ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলশ্রুতিতে বদহজম থেকে শুরু করে উচ্চ-রক্তচাপ, বহুমূত্র, পিত্তথলিতে পাথর, বাত, হাঁপানি, পেপটিক আলসার, করোনারি হৃদরোগ ও মাইগ্রেইনসহ অনেক জটিল রোগ হতে পারে।

কিন্তু এক্ষেত্রে রোযা এমন একটি মাধ্যম, যা মানবদেহের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সামঞ্জস্য রাসহ সব ধরনের রোগ প্রতিরোধে সম। কারণ পূর্ণ এক মাস রোযা রাখার পর ওইসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দৈনিক প্রায় ৫-৬ ঘণ্টা বিশ্রামের সুযোগ পায়। ফলে পরবর্তীতে এগুলো আরও শক্তি নিয়ে মানবদেহে কাজ করতে পারে। এমনকি অনবরত খাদ্যগ্রহণে মানবদেহের পেটে এক ধরনের বিষাক্ত বর্জ্য-পদার্থের সৃষ্টি হয়, যা পানাহার বা রোজা ব্যতীত পরিহার সম্ভব নয়।

রোযার পার্থিব উপকারিতায় বিগলিত হয়েই ইহুদি-খ্রিস্টানসহ বিশ্বের অনেক অমুসলিম গবেষক, বিজ্ঞানী ও ইউনিভার্সিটির প্রফেসর শারীরিক-ফিটনেস ও সুস্থ-সবল দেহ ও মনের জন্য মুসলিম পন্থায় রীতিমতো রোযা রাখছেন। হল্যান্ডের পোপ এলফ গাল ছিলেন একজন বড় পাদ্রী ও চিকিৎসক। তিনি তার দুরারোগ্য রোগীদের সুস্থতার জন্য বছরে পূর্ণ এক মাস রোযা রাখার নির্দেশ দিতেন। তিনি বলেন, 'আমি ডায়াবেটিস (Diabetes), হৃদরোগ (Hart Diseases) ও পাকস্থলী রোগে (Stomachie Diseases) আক্রান্ত রোগীদের পূর্ণ একমাস রোযা রাখার নির্দেশ দিয়ে থাকি। মূলত তার এই পদ্ধতিতে রোগীরা খুবই উপকৃত হয়েছে। বিশেষত সবচেয়ে বেশি উপকৃত হতো পাকস্থলীর রোগীরা।

এছাড়াও ডা. লুথরজেম অব ক্যামব্রিজ (Dr. Luthorjem of Cambridge), সিগমন্ড নারায়াড (Sigmond Narayad), প্যারাসাইকোলজি রিচার্স (Research of parapsychology), অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিসহ (Oxford University) বিভিন্ন বিজ্ঞানী ও গবেষণা-কেন্দ্র অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে রোযার ওপর গবেষণা করে দেখেছেন, রোযা মানবজীবনের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সুস্থতা, মানসিক-শান্তি ও প্রবৃদ্ধির অপরিহার্য নিয়ামক। আজ বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এ-দাবি খুবই যুক্তিযুক্ত, মানবদেহের যকৃতের অবসর গ্রহণের সময়কাল বছরে কমপক্ষে এক মাস হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। আর যেহেতু উপবাস ব্যতীত যকৃতের অবসর সম্ভব নয়, তাই পুরো এক মাস রোযাই এর সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম। রক্তের বিশুদ্ধতা অর্জনে ও রক্তনালীতে চর্বি জমানো থেকে বিরত রাখতে রোযার ভূমিকা অপরিহার্য। রোযার ও অজুর যৌথ প্রতিক্রিয়ায় যে শক্তিশালী সমন্বয় সাধিত হয়, তার মাধ্যমে মস্তিষ্কে রক্তপ্রবাহের এক অতুলনীয় ভারসাম্য সৃষ্টি হয়, যা সুস্থ্য থাকার পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করে। এছাড়াও রোযা দেহের অণুকোষ ও প্রজনন অঙ্গগুলোয় নব জীবনীশক্তি প্রবাহিত করে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেন– 'তোমরা যদি অনুধাবন কর, তাহলে তোমাদের জন্য এটা উত্তম যে, তোমরা রোযা রাখবে।'

(সূরা বাকারা-১৮৫)

ডা. এলেক্স হিগ বলেন, 'রোজা থেকে মানুষের মানসিক শক্তি এবং বিশেষ বিশেষ অনুভূতিগুলো উপকৃত হয়। যেমন- স্মরণশক্তি বাড়ে, মন:সংযোগ ও যুক্তিশক্তি পরিবর্ধিত হয়, প্রীতি-ভালবাসা, সহানুভূতি, অতিন্দ্রিয় এবং আধ্যাত্মিক-শক্তির বিকাশ ঘটে, ঘ্রাণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি, প্রভৃতি বেড়ে যায়। আর রোযা শরীরের রক্তের প্রধান পরিশোধক। অ্যালোপ্যাথিক শাস্ত্রে রোগ নিরাময়ের যতগুলো প্রতিকার এবং প্রতিষেধক রয়েছে, রোজা তার মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী ও ফলপ্রসূ।

মূলত এজন্যই রমযান মাসে হাসপাতাল, কিনিক ও প্রাইভেট প্র্যাকটিসে রোগীর উপস্থিতি তুলনামূলক অনেক কম হয়। এতে কি প্রতীয়মান হয় না, বরকতময় রমযান মাসে রোগব্যাধি কম প্রকাশ পায়। তাই বিষয়টি স্পষ্ট যে, রোযা রাখার ফলে আমরা যেভাবে আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য লাভ করতে পারি অপর দিকে দৈহিকভাবেও আমরা সুস্থ্য থাকতে পারব।

আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সবাইকে রমযানের অবশিষ্ট দিনগুলোতে বেশি বেশি ইবাদত বন্দেগিতে রত থেকে কাটানোর তৌফিক দান করুন, আমীন।

masumon83@yahoo.com

বাংলার কিংবদন্তি

জার্মানীর প্রথম মিশনারী
খান সাহেব মৌলভী মোবারক আলী

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

(১৮তম কিস্তি)

খান সাহেব মৌলভী মোবারক আলী, জার্মানীর প্রথম মিশনারী। জন্ম : ১৮৮১, মৃত্যু : ১লা নভেম্বর ১৯৬৯।

জার্মানীতে অনুষ্ঠিত সালানা জলসায় সেদেশের বর্তমান মিশনারী মাওলানা ইলিয়াস মনির সাহেব এক প্রাণবন্ত ঐতিহাসিক ভাষণ দান করেন। তিনি প্রথম মিশনারী মৌলভী মোবারক আলী এবং দ্বিতীয় মিশনারী হযরত মাওলানা মালিক গোলাম ফরিদ (রা.) এর অবদান ও জীবনালেখ্য বর্ণনা করেছেন। নিম্নে মৌলভী মোবারক আলীর বিষয়টি আলোকপাত করা হলো :

উপস্থিত সুধীবৃন্দ! আজকের এই অধিবেশনে আমি সেই দু'জন বুযুর্গের পরিচয় করিয়ে দিতে চাই যাঁদের জার্মানের মাটিতে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর সেবক হিসেবে পদক্ষেপ রাখার ঐতিহাসিক সৌভাগ্য লাভ হয়। তাঁরা প্রকৃতপক্ষে সেই বীজ এই ভূমিতে বপন করেছেন যা আজ ফুলে ফলে সুশোভিত বৃক্ষ এবং এক বাগানের রূপে পরিণত হয়েছে। আর আমরা প্রত্যেকেই এর সুভাসে সুভাসিত হচ্ছি। সেই মহীয়ান ব্যক্তিরা হচ্ছেন, মৌলভী মোবারক আলী সাহেব বাঙালি এবং হযরত মালিক গোলাম ফরিদ (রা.), যারা জার্মানীতে প্রথম সারির মোবাল্লেগ এবং আহমদীয়াতের সুসংবাদদাতা ছিলেন।

শ্রোতামন্ডলী! খোদা তাআলা নিজের প্রত্যাদৃষ্টদের সাহায্যের জন্য সর্বদা এরূপ উপায় উপকরণ সৃষ্টি করে থাকেন। যারা নাহনু আনসারুল্লাহ্ ধ্বনি উচ্চারিত করে, এই প্রত্যাদিষ্ট পুরুষের সাহায্যকারী হয়ে যান। সুতরাং এই সুন্নত অনুযায়ী হযরত আকদাস হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর স্বপক্ষেও সৌভাগ্যবান, আন্তরিক ও ত্যাগী সম্পন্ন সত্তাকে আল্লাহ্ তাআলা একত্রিত করে দিয়েছেন। সৈয়্যদনা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এ সকল ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে বলেন :

"এই জামাতের বয়আতের উদ্দেশ্য হচ্ছে কেবল খোদাভীরু ব্যক্তিদের একত্রিত করা, যেন এরূপ মুত্তাকীদের একটি বড় দল পৃথিবীতে এমন নেক প্রভাব বিস্তার করে এবং মতৈক্য ইসলামের জন্য কল্যাণ ও সম্মানের এবং পরিণামের দিক থেকে উত্তম হয়। আর কল্যাণমন্ডিত একত্ববাদ কলেমার উপর ঐক্যমত হওয়া ইসলামের পবিত্র উদ্দেশ্যের সেবায় যেন দ্রুত কাজে আসে।"

হুযূর (আ.) আরো বলেন,

আমি দৃঢ়বিশ্বাস পোষণ করি, যারা এই উদ্দেশ্যে এ জামাতে প্রবেশ করে এবং ধৈর্যের সাথে অপেক্ষামান থাকবে তারা এরূপই হবে। কেননা খোদা তাআলা এই দলকে নিজের প্রতাপ প্রকাশ করার জন্য এবং নিজের কুদরত প্রদর্শন করার জন্য সৃষ্টি করেছেন, যেন পৃথিবীতে খোদা প্রেমিক বান্দার পবিত্রতা, প্রকৃত নেকী, শান্তি এবং নিরাপত্তা ও মানুষের প্রতি সহানুভূতি পৃথিবীতে ছড়িয়ে পরে। সুতরাং এই দল তার একটি বিশেষ দল হবে, আর তিনি তাদেরকে নিজের পক্ষ থেকে শক্তি দান করবেন। তাদেরকে ময়লা ও অপবিত্রতা থেকে মুক্ত করবেন। তাদের জীবনে একটি পবিত্র পরিবর্তন সাধন করবেন। তিনি সেই দলকে অনেক বৃদ্ধি করবেন এবং হাজার হাজার সত্যবাদীকে প্রবেশ করাবেন। তিনি স্বয়ং তাদেরকে লালন পালন করবেন। আর তাকে ক্রমাগত উন্নতি দান করবেন। এমনকি সেগুলোর আধিক্য ও কল্যাণসমূহ দৃষ্টিতে অদ্ভুত মনে হবে। আর তা সেই প্রদীপের ন্যায় যা উচু স্থানে রাখা হয়। সমস্ত পৃথিবীকে আলোকিত করবে। আর ইসলামী কল্যাণসমূহের জন্য অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত বলে গণ্য হবে। (মজমুয়া ইস্তেহারাত ১ম খন্ড, ১৯৮ পৃ:)।

উপস্থিত শ্রোতামন্ডলী! হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর এই সমস্ত দোয়ার কল্যাণে আন্তরিক ভালোবাসা নিষ্ঠা উৎসর্গকারী সত্তাদের সেই দল প্রদান করেছেন। যারা নিজেদের গুণাবলীতে ও কর্মসমূহে তারা পৃথিবীর ইতিহাসে এক অতুলনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তারা আসহাবী কান্নুযুমে বে আইয়্যুহুম ইকতেতাইতুম..... এর লক্ষস্থলে পরিণত হয়েছিলেন। যাদের ব্যাপারে স্বয়ং আসমান থেকে খোদা তাআলা ঘোষণা দিয়েছেন যে, –ইয়ানসুরুকা রিযালুন নুহয়ী ইলাইহিম মিনাস্ সামায়ে।

এগুলো হচ্ছে সেই কল্যাণমন্ডিত সত্ত্বা যারা যুগ ইমামের আহ্বানে সাড়া দিয়ে হযরত রাসূল করীম (সা.) এর সাহাবাদের ভালোবাসা ও বিশ্বস্ততার ঘটনা পুনরাবৃত্তি করেছেন, আর প্রতিটি পদক্ষেপে সততা ও বিশ্বস্ততার অতুলনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

আমাদের মাঝে এই ভালোবাসা ও বিশ্বস্ততা এক মসীহ্‌র দোয়ার ফলে সৃষ্টি হয়েছে, সেই নিষ্ঠাবানও বিশ্বস্তদের মাঝে মৌলভী মোবারক আলী সাহেব বাঙালি ও হযরত মালিক গোলাম ফরিদ (রা.)ও ছিলেন। আজ

এই সভায় তাদের উল্লেখ করা হবে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) বার্লিন মসজিদ উদ্বোধনের সময় এই প্রাথমিক যুগের মোবাল্লেগদের বর্ণনা এভাবে করেছেন, এই দেশে শুরুতে প্রাথমিক যুগে যে মোবাল্লেগগণ এসেছেন, আর আমি এটার উল্লেখ এজন্য করতে চাই যেন, যুবকরা, বাচ্চারা এবং নতুন আগমনকারীগণ ও যারা এ দেশে বসবাস করছেন অথবা পৃথিবীর অন্য কোন দেশে বসবাস করছেন তারা যেন নিজেদের ইতিহাস সম্পর্কে কিছুটা হলেও অবগত হতে পারে। যারা আমাদের প্রাথমিক যুগের মোবাল্লেগ ছিলেন তাদের জন্য যেন দোয়ার প্রতি মনোযোগ আকর্ষিত হয়। যারা প্রথমদিকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন এবং বিভিন্ন দেশে গিয়েছেন। যারা নিজেদের দেশের বাহিরে বের হয়েছেন এবং বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করেছেন। সেই যুগে তো পরিপূর্ণ ব্যবস্থাও ছিল না। কিন্তু সেই সকল লোকেরা আহমদীয়াতের জন্য অসীম খেদমতের আবেগে কঠোর পরিশ্রম সেই সুব্যবস্থা না থাকা সত্ত্বেও প্রত্যেক স্থানে পরিচিত করিয়ে দিয়েছে। আর সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে তাদের দোয়ার প্রতি বিশেষ মনোযোগ ছিল। এ কারণে তাদের মাঝে জামাতের উন্নতির ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস বিদ্যমান ছিল। (দৈনিক আল ফযল রাবওয়া ২৫ নভেম্বর ২০০৮)।

উপস্থিত শ্রোতাগণ! বাংলায় হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সংবাদ তাঁর জীবদ্দশাই সত্য বাণী পৌঁছে যায়। আর পাঁচজন সৌভাগ্যশালী বুযুর্গ যারা বাংলার প্রাচীন লোকদের মধ্য থেকে আহমদীয়াতের নেয়ামত দ্বারা লাভবান হয়েছেন, তাদের মধ্যে একজন হচ্ছেন, মৌলভী খান সাহেব মোবারক আলী বাঙালি। তিনি বাংলার বগুড়া জেলার দিগদাইর গ্রামে ১৮৮১ খ্রী: জানুয়ারি মাসে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাথমিক শিক্ষা তিনি গ্রামেই লাভ করেন। ১৯০৫ সালে বি. এ পাশ করার পর শিক্ষকতার পেশায় যোগ দেন। আর সেই সাথে তিনি উকালতি পড়া আরম্ভ করেন। তাঁর চাচা আদালতের মুক্তার ছিলেন এবং চাচার আকাঙ্খা ছিল তিনি যেন উকিল হন। সুতরাং তিনি শিক্ষালাভ আরম্ভ করেন। কিন্তু তখনকার সময় মৌলভী সাহেব পর্যবেক্ষণ করলেন যে, এই পেশায় অনেক বেশী মিথ্যা কথা বলতে হয়। এ কারণে তিনি এই পেশাকে ঘৃণা করতে লাগলেন, ফলে তিনি চাচার ইচ্ছা সত্ত্বেও ভালভাবে উকালতি শিক্ষা সম্পন্ন করেননি।

তারপর তার চাচা তাকে ডিপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে চাকুরি করার জন্য বলেন। ইন্টারভিউয়ের পরে তার ডিপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে চাকুরি পাওয়ার সম্ভাবনা হয়। আইনি বিষয়ক সম্পূর্ণ করার জন্য কাগজপত্রসমূহে তার বয়স অবৈধভাবে ২৪ বছর লিখা হয়। কিন্তু এ বিষয়টি তাকে পরে পীড়া দেয়। আমি ম্যাজিস্ট্রেট হতে যাচ্ছি, যে মিথ্যা বলার কারণে শাস্তি দিবো। অথচ আমি নিজে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে চাকুরিতে যাচ্ছি। সুতরাং তার হৃদয় বিচলিত হয় যে, তিনি বয়সের বিষয়ে সত্য প্রকাশ করে চাকুরি হওয়া থেকে বিরত হন। আমি মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে চাকুরি করা থেকে জমিতে চাষ করাকে বেশী পছন্দ করি। এতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা তাকে ডেকে এ ভাল চাকুরির বিষয়ে বুঝান। কিন্তু তিনি কোন পরওয়া না করে শিক্ষকতার চাকুরিতে যোগ দেন। সেই সময় উচ্চ শিক্ষিত মৌলভী মোবারক আলীর এক বন্ধুর মাধ্যমে রিভিউ অফ রিলিজিয়ন্স পত্রিকার একটি সংখ্যা তাঁর হস্তগত হয়। এটা পাঠে তিনি সত্যের সন্ধানে আগ্রহী হন। কোলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ লাইব্রেরিতে রিভিউ অব রিলিজিয়ন্স তিনি অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে অধ্যায়ন করতেন। এভাবে তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ও আহমদী জামাত সম্পর্কে জানতে পারেন। তাকে যারা লক্ষ্য করত তারা হাসি ঠাট্টা করত যে, আপনি কোন যাদুকরের পুস্তক পড়ছেন। এতে তিনি পূর্বের থেকেও বেশী পর্যবেক্ষনে নিয়োজিত হন।

সেই দিনগুলোতেই তিনি স্বপ্ন দেখেন যে, তিনি একটি চকে দাঁড়িয়ে আছেন, সেখানে একটি রেখা দেখতে পান, যা ছোট পবিত্র ও ভারত বাংলাদেশ ছেয়ে ছিল। তিনি দেখেন যে, সেই রেখা ভারতের উত্তর পশ্চিম দিক থেকে একটি আলো আকাশ থেকে নেমেছে। সেই আলো খুবই উজ্জ্বল ছিল। আর ধীরে ধীরে তা একটি আলোতে হয়ে হিন্দুস্থানের উত্তর পশ্চিমের এক অঞ্চলে একস্থানে পড়েছিল। অত:পর সেই স্থান থেকে গ্রামোফোনের ন্যায় গোল গোল ঢেউ সৃষ্টি হয়ে আস্তে আস্তে ছড়াতে আরম্ভ করে। আর এই রেখা -ঢেউসমগ্র ভারত ছেয়ে যায়। এমনকি এই রেখা বাংলাদেশে পৌঁছায়। অত:পর সেই রেখা সমস্ত পৃথিবীকে আবৃত করে ফেলে।

সেই সময়ের কথা, একদা মৌলভী সাহেব কুরআন করীমের কোন একটি আয়াত মনোযোগ সহকারে দেখছিলেন। তিনি একটি দৃশ্যে দেখেন একটি কক্ষ যাতে এক ব্যক্তি পাগড়ী পরিহিত বসে আছেন এবং তার সামনে আরো কিছু লোক যারা তার বিশ্বাসে বিশ্বাসী। তাদের মধ্য থেকে বেশ কিছু লোকের চেহারা খুবই সুন্দর লাল ও সাদা বর্ণের। সেই বুযুর্গ দূরে বসেছিলেন। কিন্তু আসতে আসতে কাছে চলে আসেন। এমনকি তিনি তাদের একেবারে নিকটে চলে আসেন। পরিশেষে তিনি এত নিকটে আসেন যে তাঁর দেহের সাথে মিশে যান। এইদৃশ্য মৌলভী সাহেব দেখেন। এরপর তিনি চাকুরির জন্য ফরিদপুর চলে যান। সেই সময়ে তিনি মানুষের অস্তিত্ব ও পরিণতির ব্যাপারে চিন্তা ভাবনায় নিয়োজিত হন। কঠিন দুর্ভিক্ষে তিনি মানব সেবা সংগঠন খাদেমুল ইসলামের জেনারেল সেক্রেটারী হিসেবে লোকজনের কল্যাণার্থে চাঁদা তোলেন। সেই সময় তিনি এটা খুব ভালভাবে অনুধাবন করেন যে, মানুষ কতটুকু ক্ষতির সম্মুখী, আর এই অবস্থা তাকে প্রকৃত সত্যের সন্ধানের জন্য বাহনের ভূমিকা পালন করেছেন। সেই সত্যের সন্ধানে তিনি কাদিয়ানে পৌঁছেন, যা তিনি কাশফে দেখেছেন। যে পাগড়ী পরিহিত এক বুযুর্গ বসে আছেন, আর তার সম্মুখে বিভিন্ন বয়সের লোকেরা বসে রয়েছেন এবং সেই বুযুর্গ তাদের কুরআন করীম পড়াচ্ছিলেন। এখানে তিনি কয়েকদিন অবস্থান করেন এবং সেই সময় তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর স্বভাব চরিত্রের ব্যাপারে হিন্দু মুসলমান ও শিখদের খুব ভালভাবে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি লক্ষ্য করেছেন যে, কাদিয়ানের জীবন যাত্রা অত্যন্ত সাদাসিধা ও পরিপূর্ণ কুরআনের শিক্ষা অনুযায়ী, লোকদের চাল চলন ইসলামী জীবন যাত্রার মত। যে কারণে তিনি অবচেতন মনে বলে উঠেছেন আমি পৃথিবীতেই জান্নাত দেখেছি। তার দৃঢ়বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হল যে, এই সেই ব্যক্তি যাকে আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম। সুতরাং তিনি বয়াতের জন্য প্রস্তুত হলেন। কিন্তু হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওয়াল (রা.) আরো কিছুদিন বিশেষভাবে যাচাই বাচাই করার জন্য বললেন।

পরিশেষে ১৯০৯ সালের একদিন সকালে তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওয়াল (রা.)-এর নিকট উপস্থিত হন এবং বিনয়ের সাথে বলেন, হুযূর আমি মানসিক পর্যদুস্ত আমার বয়াত নিন, যার ফলে এ উদ্দেশ্য

সফল হয়। বয়আতের পরে তিনি তার বিগত জীবনের জন্য অনেক কান্নাকাটি করেন, আর সেই অবস্থায়ই তিনি আবেদন করেন যে, হুযূর যদি অনুমতি দেন তাহলে আমি আমার জীবন ইসলামের জন্য উৎসর্গ করে দিতে চাই।

বয়আতের পরে তাঁর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-র সাহচর্যে কিছু দিন থাকার সৌভাগ্য হয় এবং তিনি নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততায় এত উন্নতি করেছেন যে, পরের বছরই হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) দশজন সদস্য সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করেন, যার নাম ভ্রাতৃ সংঘ কমিটি, তাকে সেই কমিটির একজন সদস্য হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। কাদিয়ান থেকে যখন বাড়িতে ফেরত আসলেন তখন বিরোধিতা আরম্ভ হয়ে যায়। চারদিক থেকে কাদিয়ানী হয়ে গেছে, কাফের হয়ে গেছে এই আওয়াজ উচ্চারিত হচ্ছিল। তার সাথে খারাপ ব্যবহার করা আরম্ভ হল। কিন্তু তিনি ঈমান আনয়নের পরে দৃঢ়তা প্রদর্শন করেন, যার ফলে বিরোধিতা অল্পকিছুদিন পরেই ধোয়ার ন্যায় বিনষ্ট হয়ে যায়।

কাদিয়ানের পরিবেশ তাঁর কাছে এত ভাল লাগে এবং খলীফার সহচর্যের এরূপ আবেগ সৃষ্টি হয়েছে যে, নিজের চাকুরি থেকে এক বছরের ছুটি নিয়ে কাদিয়ান চলে যান। তিনি তার এই সময় কাদিয়ানের দারুল আমানে বুযূর্গদের সহচর্যে এবং হযরত শের আলী (রা.)র সাথে কুরআন করীমের অনুবাদের কাজে জড়িত হন। সেই সময় তিনি নিজে হযরত হাফেজ রৌশন আলী (রা.)কে সাথে নিয়ে কয়েক মাস বাংলার বিভিন্ন স্থানে তবলিগী অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। ১৯১৫ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ইংরেজি অনুবাদ কমিটির সদস্য নিযুক্ত হন। ছুটি শেষ হওয়ার পরে দেশে ফেরত আসেন এবং সরকারি দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি তবলীগের কাজেও ব্যস্ত থাকেন। তিনি বাংলায় প্রথম আঞ্জুমানে আহমদীয়ার সদস্য হন।

তিনি যখন নিজের অঞ্চলে হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন, তখন তার দায়িত্ব পালন এত উচু মানের ছিল যে, সাধারণ মানুষের মুখে মুখে তাঁর প্রশংসা ছিল। একজন গয়ের আহমদী বন্ধু বর্ণনায় বলেন–

"বগুড়া জেলা স্কুলের সাবেক প্রধান শিক্ষক দায়িত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। তিনি খান সাহেব মোবারক আলী। তিনি কাদিয়ানী ফেরকায় সম্পর্ক রাখতেন। তিনি নি:সন্দেহে উচ্চ পর্যায়ের খোদাভক্ত, সরল হৃদয়ের অধিকারী ও মানুষের বিশ্বস্ত সেবক ছিলেন। প্রধান শিক্ষক হিসেবে তার সুনাম ও মর্যাদা নিম্নের ঘটনা থেকে স্পষ্ট হয়–

একদিন নবম শ্রেণীর এক ছাত্র তার স্বর্ণের আংটি হারিয়ে ফেলে। আংটি হারানো সংবাদ শুনা মাত্রই প্রধান শিক্ষক সবাইকে ডাকেন। ছাত্র শিক্ষক সবাই সাড়িবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়। প্রধান শিক্ষক খান সাহেব ভাবগাম্ভীর্যের সাথে এসে মাথা উচু করে বলেন, নবম শ্রেণীর এক ছাত্রের একটি আংটি হারিয়ে গেছে, আমার বিশ্বাস বাহির থেকে কেউ এটা চুরি করতে আসেনি। ছাত্রদের মধ্য থেকেই কেউ এ কাজ করেছে। আমি প্রধান শিক্ষক হিসেবে বলছি, আজ স্কুল ছুটির পূর্বেই এই হারানো আংটি সহকারী প্রধান শিক্ষকের কাছে জমা দিতে হবে। যদি চোর আংটি ফেরত না দেয় তাহলে কাল থেকে আমি আর স্কুলে আসব না। কেননা যে স্কুলের ছাত্ররা চোর খান সাহেব মোবারক আলী সেই স্কুলের প্রধান শিক্ষকতা করবেন না। একথা ছাত্রদের উপর এরূপ প্রভাব ফেলে যে, সেই দিন ছুটির পূর্বেই হারানো আংটি সহকারী প্রধান শিক্ষকের কাছে জমা করা হয়।"

চট্টগ্রামে চাকুরির পাশাপাশি ধর্মের সেবায় অনেক বেশী নিয়োজিত থাকেন তিনি। সেই সময় তিনি চট্টগ্রামের সম্মানিত ব্যক্তিদের নিকট সত্যের বাণী পৌঁছান, যার ফলে অনেক ভাল ফলাফল প্রাপ্ত হন। পরবর্তীতে কয়েকজন বয়আত করে আহমদীয়া জামাতের বেশ ভাল সেবা করেন।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) ১৯১৭ সালে ওয়াকফে জিন্দেগীর যে তাহরীক করেন সেই তাহরীকে যে ৬৩ জন যুবকের নাম উপস্থাপিত হয়েছিল, তাদের মাঝে মৌলভী মোবারক আলী সাহেবের নামও ছিল। ফলে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) তাকে নাইজেরিয়া যাওয়ার কথা বলেন। প্রিয় ইমামের ডাকে সাড়া দিয়ে তিনি ১৯২০ সালে নিজ খরচে লন্ডন পৌঁছেন। পরবর্তীতে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) তাকে ইংল্যান্ডেই অবস্থান করতে এবং মোবাল্লেগেরে সাথে কাজ করার নির্দেশ প্রদান করেন। ১৯২২ সালে জার্মানীতে মিশন হাউস প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত করেন। মৌলভী মোবারক আলী সাহেব বাঙালিকে হুযূর (রা.) জার্মানীতে যাবার নির্দেশ দেন। ফলে মৌলভী সাহেব দ্রুত বার্লিন পৌঁছে যান এবং নিজের সামর্থ অনুযায়ী প্রচারের কাজ আরম্ভ করে দেন। তাঁর প্রাথমিক প্রচেষ্টায় খোদা তাআলার ফজলে কি সফলতা লাভ হয়েছে এ ব্যাপারে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বলেন, 'তাঁর রিপোর্ট অত্যন্ত আশাব্যাঞ্জক বলে প্রমাণিত হয়েছে। বরং তিনি সেই দেশে সফলতার ব্যাপারে এ রূপ দৃঢ়বিশ্বাস রাখেন যে, তিনি ধারাবাহিকভাবে আমাকে লিখেন, সেখানে যেন একটি মসজিদ ও কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হয়'। এতে হুযুর জমি ক্রয়ের কথা বললে মৌলভী মোবারক আলী সাহেব বার্লিন শহরে দুই একর জমি ক্রয় করেন। অত:পর দ্রুতই মসজিদের কাজ আরম্ভ করেন। কিন্তু রাজনৈতিক ও দেশীয় অবস্থার কারণে মসজিদের কাজ বন্ধ রাখতে হয়। তারপর ১৯২৫ সালে হুযূর (রা.)-এর নির্দেশে নিজ দেশে ফেরত চলে আসেন। এভাবে তিনি ১৯২০ থেকে ১৯২৪ সাল পর্যন্ত ইউরোপে ইসলামের প্রচারের কাজে অতিবাহিত করেন। তাঁর তবলীগি কাজের সফলতার বিষয় থেকে অনুমান করা যায়। সেই যুগে মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর অনুষ্ঠানে অনেক লোক উপস্থিত ছিলেন। চারজন বিশেষ ব্যক্তিকে দাওয়াত দেয়া হয়েছিল। তার সাথে খোদা তাআলার অদ্ভুত রহমত ছিল। এখানে এ বিষয়টি উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, তখন তাঁর টিবির মত মারাত্মক রোগ হয়, যার কারণে সবাই দুশ্চিন্তা গ্রস্থ হয়ে পড়ে। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা উত্তমভাবে তাঁকে আরোগ্য দান করেন।

জার্মানী থেকে ফিরে এসে পুনরায় শিক্ষা বিভাগে চাকুরিতে যোগদান করেন। তৎকালীন বৃটির সরকার তাঁর অতুলনীয় সেবা পর্যবেক্ষণ করে তা 'খান সাহেব' উপাধিতে সম্মানিত করেন। ১৯৩৮ সালে তিনি হজ্জব্রত পালনের সৌভাগ্য লাভ করেন। ১৯৪০ সালে চাকুরি থেকে অবরপ্রাপ্ত হয়ে সম্পূর্ণভাবে ধর্মের সেবায় নিয়োজিত হন। সেই বৎসরই তিনি বাংলার আমীর নিযুক্ত হন। ধর্মীয় সেবার পাশাপাশি তিনি অনেক জনকল্যাণমূলক কাজও করেন। বগুড়া শহরে মূখ ও বধিরদের জন্য একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। ধর্মীয় সেবা ও মানবতার সেবার উত্তম জীবন অতিবাহিত করার পরে ১৯৬৯ সালের নভেম্বরে তিনি তার প্রকৃত বন্ধুর কাছে চলে যান এবং বগুড়াতেই তাকে সমাহিত করা হয়।

(চলবে)

চলে গেলেন
প্রফেসর রাজিব উদ্দিন ও শফিক আহমদ

আহমদ তবশির চৌধুরী

মানুষ চিরকাল বেঁচে থাকেনা, "জন্মিলে মরিতে হইবে" এটাই চির সত্য। কিন্তু মানুষ বেঁচে থাকে তার কর্মে, তার আদর্শে, বেঁচে থাকে তার নেক সন্তানদের মাঝে। তেমনি দুই নিষ্ঠাবান ব্যক্তিত্ব প্রফেসর রাজিব উদ্দিন আহমদ সাহেব এবং জনাব শফিক আহমদ সাহেব। তাঁরা দু'জন একই দিন অর্থাৎ গত ২১ জুন, ২০১২ মাত্র কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে ঢাকায় ইন্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাযিউন। রাজিব উদ্দিন সাহেব ইন্তেকাল করেন ঐদিন সন্ধ্যায় সাড়ে ৬ টার দিকে আর শফিক আহমদ রাত ৯:৪০ এ। দু'জনের সাথেই আমার অনেক ঘনিষ্ঠতা ছিল।

রাজিব উদ্দিন সাহেব ছিলেন বয়াতকারী আহমদী, ১৯৭৩ সালে তিনি বয়াত করে আহমদীয়া জামা'ত ভুক্ত হন। তিনি ছিলেন একজন মুক্তিযোদ্ধা। তাঁকে আমি প্রথম দেখি ময়মনসিংহে, সম্ভবত: সত্তরের শেষ অথবা আশির দশকের প্রথম দিকে। বিশেষ কোন কাজ উপলক্ষ্যে তিনি তখন ময়মনসিংহে এসেছিলেন বা কিছু দিন অবস্থান করেছিলেন। সে সময় তাঁকে দেখেছি আমার মরহুম পিতার সাথে বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয় নিয়ে আলাপ করতে। তাঁর সাথে আমার পিতার যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা ছিল। সে সুবাদেই তাঁর সাথে আমারও পরিচয়। যদিও বয়সের পার্থক্যের কারণে তখন তাঁর সাথে আমার এতটা ঘনিষ্ঠতা হয় নি। তবে জামা'তের প্রতি তার আনুগত্য, জ্ঞানের চর্চা এবং আহমদীয়াতের প্রচারে তাঁর ব্যাকুলতা আমাকে মুগ্ধ করেছিল।

প্রফেসর রাজিব উদ্দিন সাহেব দীর্ঘ দিন বগুড়া জামা'তের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে তিনি মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া এবং মজলিস আনসারুল্লাহর নানা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন।

রাজিব উদ্দিন সাহেবের সাথে আমার ঘনিষ্ঠতা সুদৃঢ় হয় ২০০৩ সালের পর। আমার উপর মজলিস আনসারুল্লাহর সদরের দায়িত্ব অর্পিত হলে তাঁকে আমি রাজশাহী ও বগুড়া অঞ্চলের রিজিওন্যাল নাযেমের দায়িত্ব প্রদান করি। অবশ্য এর পরেও তিনি উক্ত দায়িত্ব পালন করেছেন। আমার সাড়ে ৬ বছরের সদরের দায়িত্ব পালন কালে মরহুম রাজিব উদ্দিন সাহেবের সহযোগিতা, নিষ্ঠা ও দায়িত্ববোধ আমাকে অভিভুত করেছে। তিনি তার অধীনস্থ এলাকায় মজলিসের কার্যক্রমকে সুসংগঠিত করেন এবং বিস্তৃতি প্রদান করেন। আগেই উল্লেখ করেছি যে, তিনি আমার চাইতে বয়সে বেশ বড় ছিলেন। কিন্তু সদর হিসাবে খাকসারের প্রতি তার আনুগত্য আমাকে অভিভুত করেছে। খাকসারের প্রতি তার যে সম্মান প্রদর্শন, তার আদব এবং বিনয় অনেক সময় খাকসারকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে দিত।

২০০৭ সালে বাংলাদেশে প্রলয়ঙ্করী সিডর আঘাত হানার পর পরই মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের নির্দেশে খাকসার মজলিস আনসারুল্লাহর একটি টিম নিয়ে পটুয়াখালী ও বরগুনার উপদ্রুত অঞ্চলে প্রাথমিক ত্রান পৌছাতে যাই। ঢাকা থেকে খাকসারের সাথে জনাব গোলাম কাদের সাহেব এবং বগুড়া থেকে জনাব রাজিব উদ্দিন সাহেব এসে আমাদের সাথে যোগ দেন। তারা ছিলেন উথুলীর আব্দুল গফুর মাস্টার সাহেব এবং বরিশালের ডাঃ আব্দুল খালেক সাহেব। এরা তখন যথাক্রমে খুলনা এবং বরিশালের রিজিওন্যাল নাযেম হিসাবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। স্থানীয় ভাবে আমাদের সাথে আরো যোগ দিয়েছিলেন পটুয়াখালীর প্রেসিডেন্ট জনাব দেলোয়ার সাহেব, এলাকার দায়িত্ব প্রাপ্ত মুরব্বী মাওলানা শামসুদ্দিন আহমদ মাসুম, মোয়াল্লেম তৌহিদুল ইসলাম, মোয়াল্লেম ইদ্রিস, খাকদানের জনাব জালাল মাস্টার সাহেব, তার ছেলে জুয়েল প্রমুখ। আমরা পটুয়াখলী থেকে মাইক্রোবাস যোগে কুকুয়া, খাকদান, আউলিয়াপুর, কৃষ্ণনগর এবং কাউনিয়া সফর করি এবং ন্যাশনাল আমীর সাহেবের পক্ষ থেকে প্রাথমিক ত্রান সাহায্য প্রদান করি এবং ক্ষয়-ক্ষতির পরিমান নিরূপন করি। সে মূহুর্তে আমাদের পক্ষে বড় বাইশদিয়া যাওয়া সম্ভব না হওয়ায় ওখান থেকে গাজী ওমর ফারুক সাহেব এবং আব্দুর রব মেম্বার সাহেব পটুয়াখালী আসেন এবং প্রাথমিক ভাবে তাঁদের মাধ্যমে কিছু ত্রান পৌছানোর ব্যবস্থা করা হয় এবং ক্ষয়ক্ষতির একটা ধারনা নেয়া হয়। প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য যে, পরবর্তীতে হিউম্যানিনিটি ফার্স্ট এর পক্ষ থেকে সেখানে ত্রান কার্য পরিচালনা করা হয়।

আমরা আমাদের চলার পথে সিডরের যে ভয়ঙ্কর ধ্বংসযজ্ঞ দেখেছি তা স্বচক্ষে না দেখলে অনুমান করা দুষ্কর। মাইলের পর মাইল দুপাশে কেবল ধ্বংস আর ধ্বংস! গাছগুলো দেখে মনে হচ্ছিল যেন কেউ মেশিন গান দিয়ে ব্রাশফায়ার করে ফেলে দিয়েছে। আর যেগুলো দাঁড়িয়ে ছিল সেগুলো দেখে মনে হচ্ছিল যেন আগুন লেগে পুড়ে গিয়েছে। বাড়ি-ঘর গুলোর অবস্থাও ছিল অত্যন্ত শোচনীয়; হয় একেবারে মাটির সাথে মিশে গিয়েছে নয়তো ভেঙ্গে চুরে চুরমার হয়ে গিয়েছে। কোন কোন ঘর বা ঘরের ছাউনি কয়েক মাইল দূরে অন্যত্র নিয়ে ফেলেছে। আমরা যাবার পথে অনেক জায়গায় উপড়ে যাওয়া গাছগুলো সরিয়ে সরিয়ে আমাদের পথ এগুতে হয়েছে। আমাদের এই কয়েকদিনের ত্রান কাজে তিন বর্ষিয়ান আনসার জনাব আব্দুল গফুর মাস্টার সাহেব, ডাঃ আব্দুল খালেক সাহেব এবং প্রফেসর রাজিব উদ্দিন সাহেব যে নিরলস শ্রম দিয়েছেন তা অনেক তরুণের সেবাকে হার মানায়। আল্লাহ্‌তা'লা তাঁদের সবাইকে উপযুক্ত পুরষ্কারে ভূষিত করুন, আমীন।

মৃত্যুর প্রায় তিন বছর আগে থেকে অসুস্থতা জনিত কারনে প্রফেসর রাজিব উদ্দিন সাহেব অনেকটা বাড়িতেই অবস্থান করতে থাকেন। ২০০৯ সালের ডিসেম্বরে মজলিস আনসারুল্লাহর জাতীয় ইজতেমায় অসুস্থতার জন্য তিনি অংশ নিতে পারেন নি। এটি ছিল সদর হিসাবে আমার শেষ ইজতেমা। খাকসারের দায়িত্বকালে যাঁরা অসামান্য অবদান রেখেছিলেন তাঁদেরকে সেই ইজতেমায় সম্মাননা প্রদান করা হয়। চিকিৎসার জন্য সে সময় রাজিব উদ্দিন সাহেব ঢাকায় তার মেয়ের বাসায় অবস্থান করছিলেন। ইজতেমা শেষে খাকসার মজলিস আমেলার কয়েকজন সদস্য এবং তার মেয়ের শ্বশুর এবং খুলনার রিজিয়ন্যাল নাযেম জনাব আব্দুল গফুর মাস্টার সাহেবকে সাথে নিয়ে তার সাথে দেখা করতে যাই এবং তার হাতে সম্মাননার স্মারক তুলে দেই। তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন।

রাজিব উদ্দিন সাহেবের শেষ অসুস্থতা এবং চিকিৎসার জন্য তার ঢাকায় অবস্থানের খবর দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি আগে জানতে পারিনি, তাই একটা আফসোস রয়ে গেল। জানতে পারলে তাকে শেষ দেখাটি দেখে আসতে পারতাম তার জীবদ্দশাতেই। মৃত্যুও খবরও পেয়েছি দেরিতে, শফিকের মৃত্যুর খবরের পর। যখন সংবাদ পাই ততক্ষনে তার নামাযে জানযা হয়ে গিয়েছে দারুত তবলিগে, ঢাকায়। শফিকের লাশ নিয়ে আমরা যখন দারুত তবলীগে পৌছি তখনও তার লাশবাহী গাড়িটি ওখানেই ছিল, ফলে অন্ততঃ

শেষ দেখাটি দেখাটি দেখতে পেরেছিলাম।

এবার আসি শফিক আহমদ প্রসঙ্গে। ইঞ্জিনিয়ার শফিক আহমদ বয়সে আমার চাইতে সামান্য কিছু বড় ছিল; কিন্তু ছোট বেলায় একসাথে তালিম-তরবিয়তী ক্লাশ করার সুবাদে তার সাথে আমার একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, ফলে আমরা একে অপরকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করতাম। খোদ্দাম থাকা কালে আমরা এক সাথে কাজ করেছি। আমরা উভয়েই মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ এর মজলিস আমেলার সদস্য ছিলাম। খাকসার ২০০৩ সালে মজলিস আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশ এর সদরের দায়িত্ব প্রাপ্ত হওয়ার পর দ্বিতীয় বর্ষে (২০০৪) তাকে মজলিস আনসারুল্লাহ ঢাকার যয়ীমে আ'লার দায়িত্ব প্রদান করি। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠা এবং দক্ষতার সাথে সে দায়িত্ব পালন করেন এবং মজলিস আনসারুল্লাহ ঢাকাকে সুসংগঠিত করে একটি উচ্চতর মার্গে উন্নীত করেন। তার সময় থেকেই মজলিস আনসারুল্লাহ ঢাকার কার্যক্রম বৃদ্ধি পেতে থাকে যা পরবর্তী কালে জনাব নাসিরুদ্দিন মিল্লাত সাহেবের সময়েও অব্যাহত রয়েছে। তার সময়েই প্রথম ঢাকা মজলিসের উদ্যোগে আনসারুল্লাহ 'মিলন মেলার' প্রচলন করা হয়। খাকসারের সদরের দায়িত্ব কালের শেষ বছরে শফিক আহমদ নায়েব সদরের দায়িত্ব পালন করেন।

২০০৮ সালে মজলিস আনসারুল্লাহ, বাংলাদেশ ফতুল্লায় খিলাফত শতবার্ষিকী স্মারক মসজিদ নির্মানের কার্যক্রম হাতে নিলে ইঞ্জিনিয়ার শফিক আহমদকে এর প্রজেক্ট ইনচার্জ করা হয়। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠা ও সফলতার সাথে এই দায়িত্ব পালন করেন এবং মাত্র সাত মাসের মধ্যে (৭ নভেম্বও ২০০৮ থেকে ২২ মে ২০০৯) এই সুরম্য দ্বিতল মসজিদেও নির্মান কাজ সমাপ্ত হয়। মসজিদের নকশা এবং কারিগরি নির্দেশনার ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান রয়েছে। আমার জানা মতে সুন্দরবন জামা'তের নতুন মসজিদের নকশাতেও তার অবদান রয়েছে।

শফিক অত্যন্ত সদালাপী ও সদা হাস্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। তিনি বেশ ক'বছর আহমদীয়া জামা'ত বাংলাদেশের সেক্রেটারী তালিমের দায়িত্বও পালন করেন। তাঁর অসুস্থতার দিনগুলিতে বিভিন্ন সময় তাকে দেখতে হাসপাতালে এবং তার বাসায় গিয়েছি। তিনি জানতেন যে, তাঁর যে অসুস্থতা থেকে সুস্থ হয়ে উঠার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে, কিন্তু তা সত্যেও আমি তাঁর মধ্যে এতটুকু বিচলিত ভাব লক্ষ্য করিনি। এত অসুস্থতার মধ্যেও তাঁর স্বভাবজাত সেই হাসি ম্লান হয়নি। তাঁর মৃত্যুর ঠিক এক সপ্তাহ আগে আমি এবং মোবাল্লেগ ইনচার্জ মাওলানা আব্দুল আউয়াল সাহেব তাঁকে দেখতে তাঁর বাসায় যাই। দীর্ঘদিন অসুস্থতার কারনে তখন তিনি খুবই দূর্বল ছিলেন এবং শীর্ণকায় হয়ে গিয়েছিলেন, গলার স্বরও তখন বেশ ক্ষীণ। দেখে মনে হচ্ছিল যে তাঁর সময় হয়তো শেষ হয়ে আসছে। কিন্তু এর মাঝেও তাঁকে স্বাভাবিক দেখলাম, তিনি বিছানায় শুয়ে ছিলেন, এর মাঝেও আমাদের দেখে তাঁর স্বভাবজাত হাসি দিয়ে আমাদের সালামের উত্তর দিলেন। প্রায় আধাঘন্টা আমরা তাঁর সাথে ছিলাম, চিকিৎসা ও ঔষধ বিষয়ে কথা হলো। সেই সাথে তিনি একটা স্বপ্নের কথা শুনালেন, যেখানে তিনি তাঁর সিঙ্গাপুর প্রবাসী মেয়ে নাজের আসার কথা বললেন, তিনি এও বললেন যে, তিনি শুক্রবারে ইন্তেকাল করবেন, ঢাকায় প্রথম জানাজার নামাযের পর, তাঁর জানাজা ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় নিয়ে যাওয়া হবে। তিনটি মাইক্রোবাস থাকবে, মাঝখানটিতে তাঁর লাশ থাকবে ইত্যাদি। আল্লাহ্‌র কি মহিমা, তাঁর মৃত্যুর আগের দিন তাঁর মেয়ে নাজ সিঙ্গাপুর থেকে এসে পৌঁছায় আর বৃহস্পতিবার দিনগত রাতে (ইসলামী হিসাবে অনুযায়ি তখন শুক্রবার শুরু হয়ে গেছে) তাঁর মৃত্যু হয়। শুক্রবারে বাদ ফজর ঢাকায় দারুত তবলীগে প্রথম জানাজা এবং এরপর বাদ জুমুআ ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় দ্বিতীয় নামাযে জানাজার পর তাঁকে সেখানে দাফন করা হয়। ঢাকা থেকে ঠিক তিনটি মাইক্রোবাস- সামনে একটি, মাঝখানে লাশবাহী মাইক্রো (এম্বুলেন্স) আর পিছনে আরেকটি মাইক্রোবাস লাশ নিয়ে যাত্রা করে, যেমনটি তিনি বলেছিলেন।

রাজিব উদ্দিন সাহেব এবং শফিক আহমদের মৃত্যু আমাদেরকে ব্যথিত করেছে, জামা'ত দু'জন নিষ্ঠাবান সেবককে হারালো। শফিকের মৃত্যুটা আরেকটু বেশী মনে দোলা দিয়েছে। এর কারন আমরা প্রায় কাছাকাছি বয়সের ছিলাম। খাকসার, শফিক, শহিদুল ইসলাম বাবুল, গোলাম কাদের, হালিম আহমদ হাজারী, সারোয়ার মোর্শেদ, মসিহুর রহমান, খালেদ বিন কাশেম, আব্দুর রশীদ, আব্দুল্লাহ ইউসুফ মোহাম্মদ, মাহবুব আজম রেযা প্রমুখ আরো কয়েকজন আমরা প্রায় নিকট বয়সী এবং মজলিস আনসারুল্লাহর একটা টিম হিসাবে কাজ করেছি, তার মাঝে থেকে শফিকের চলে যাওয়াটা যেন একটি মালায় ছেদ পড়লো, জানিনা এর পর কার ডাক আসবে।

আজ রাজিব উদ্দিন সাহেব নেই, নেই শফিকও। কিন্তু তাঁরা বেঁচে থাকবেন তাঁদের কর্মে, তাঁদের আমলে, তাঁদের নেক সন্তানদের মাঝে। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁদের পরিবারকে সবরে জামিল দান করুন এবং জান্নাতে তাঁদের মর্যাদা উন্নীত করুন, আমীন।

অকস্মাৎ রফিক ভাই !

উপরের লেখাটি ১৯ জুলাই বৃহস্পতিবার দিনগত রাতে শেষ করে ঘুমাতে গেলাম। পরদিন শুক্রবার, ২০ জুলাই। ভোরে ফযরের নামায পরে শুয়েছি। শুক্রবার, একেতো ছুটির দিন, তাছাড়া তেমন কাজও নেই সকাল সকাল, তাই একটু দেরীতে উঠার নিয়ত। ঘুমেই ছিলাম, হঠাৎ মোবাইলটা বেজে উঠলো, ধরবো কি না ভাবতে ভাবতে ফোনটা হাতে নিলাম, দেখি ইব্রায়েতুল হাসান সাহেবের ফোন, ধরলাম আর যে খবরটি পেলাম তা একেবারে অপ্রত্যাশিত, রফিক ভাই নেই। তখন সকাল ৮:৫৮। বললেন, আজ সকাল সাড়ে ৭টার দিকে নাখালপাড়ার নিজ বাসায় স্ট্রোকে শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেছেন।

ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাযিউন। প্রচন্ড একটা আঘাত বুকে এসে লাগল। একি শুনছি !! একজন সতীর্থ শফিকের বিয়োগ সইতে না সইতেই আরেকজন? মাত্রই গত রাতে লিখেছি, "জানিনা এরপর কার ডাক আসবে।" আর তা এভাবে ফলে যাবে ?

রফিক ভাই আর আমি, আমরা দুজনও প্রায় একই বয়সী। একসাথে সেই খোদ্দাম থেকে কাজ করছি: অত্যন্ত সাহসী, নিবেদিত প্রাণ আরেকটি কর্মী। তাঁর সাহসীকতা এবং জামা'তের জন্য উৎসর্গীত মানসিকতার কারনে তাঁর উপর সব সময় নিরাপত্তার দায়িত্ব অর্পিত হতো। সেই যুবক বয়স থেকেই যখনই কোথাও বিরুদ্ধবাদী বা উগ্রবাদীদের আক্রমনের হুমকী এসেছে রফিক ভাই এগিয়ে এসেছেন, ওদের হুঙ্কার আর আক্রমনের ভয় তাঁকে কোনদিন এতটুকুও বিচলিত করেনি, বরং মনে হয়েছে আল্লাহর রাস্তায় নিজেকে বিলিয়ে দেয়ার জন্য সর্বদা প্রস্তুত। জামা'তের পক্ষ থেকে যেকোন প্রয়োজনে যখনই ডাক এসেছে, রফিক ভাই সদা প্রস্তুত, নিজের ব্যবসা-বানিজ্য কাজ ফেলে দিনের পর দিন তিনি জামা'তকে সেবা দিয়েছেন।

বহু গুণের অধিকারী রফিক ভাইয়ের আরেটি গুণ ছিল, পরোপকার। কেবল জামা'তের ভেতরেই নয়, বাইরের যে কারো সমস্যার সমাধানে তিনি জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। তিনি ছিলেন গরীব ও দুঃখি মানুষের বন্ধু।

রফিক ভাই জীবিতাস্থায় যেমন মোখালিফাত বা বিরোধিতার মোকাবেলা করেছেন, মৃত্যুও পরও যেন তা তাঁকে ছাড়েনি। তাঁর বাসার কাছে রহিম মেটাল মসজিদ সংলগ্ন কবরস্থান এবং সড়ক ও জনপথ বিভাগের কবরস্থানে তাঁর দাফনে মোল্লার দল বিরোধিতা করে। পারিবারিক ঐতিহ্য এবং এলাকায় সুনাম থাকার কারণে পরে তাঁকে সড়ক ও জনপদ বিভাগের কবরস্থানে দাফন করা হলেও মোল্লার দল সেখানেও হৈ চৈ করে, কিন্তু স্থানীয় গণ্যমান্যদের হস্তক্ষেপের কারণে মোল্লারা শেষ পর্যন্ত সুবিধা করতে পারেনি।

রাজিব উদ্দিন সাহেব মোটামুটি পরিণতঃ বয়স এবং অসুস্থ আর শফিকের বয়স তেমন না হলেও তাঁর অসুস্থতা আমাদের মোটামুটি প্রস্তুত রেখেছিল যে কোন সময়ের জন্য, কিন্তু রফিক ভাইয়ের চলে যাওয়াটা একেবারেই আকস্মিক। আল্লাহ্ তা'লা এই নিবেদিতপ্রাণ মরহুমদের উপর তাঁর রহমতের বারি বর্ষণ অব্যাহত রাখুন, তাঁদের মানবীয় ত্রুটিগুলো ক্ষমা করুন এবং জান্নাতে তাঁদের মর্যাদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করতে থাকুন, আমীন।

পাঠক কলাম

[পাঠক কলামের এই আয়োজনে এবারের বিষয় ছিল **'পবিত্র রমযান আমাদের কি শিক্ষা দেয়।'** পাঠকদের পাঠানো লেখা দিয়ে সাজানো হলো পাঠক কলামের এই অংশ]

রমযান সারা বছরের পাপকে ধূয়ে মুছে পরিশুদ্ধ করার মাস

রমযান মস হলো পবিত্র সিয়াম সাধনার মাস। এ মাস সারা বছরের পাপকে ধূয়ে মুছে পরিশুদ্ধ করার মাস। পবিত্র কুরআনের নূরে আলোকিত হবার মাস, বেহেশ্‌তী স্পন্দনে আলোকিত হয়ে খোদার সন্তুষ্টি অন্বেষণে নব উদ্যামে ঝাপিয়ে পড়ার মাস এ পবিত্র রমযান। রমযান মাসের সাথে ইবাদতের এক গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। এক্ষেত্রে রমযান মাসকে যদি ইবাদতের মেরাজ বলা হয় তাহলে ভুল হবে না। রোযা ইবাদতের দরজা স্বরূপ। এ সম্পর্কে হযরত নবী করীম (সা.) বলেছেন,–প্রত্যেক জিনিসের একটি নির্দিষ্ট দরজা থাকে আর তেমনি ইবাদতের দরজা হলো রোযা।

ইসলামের পাঁচটি রোকনের মধ্যে রোযা হচ্ছে তৃতীয়, আরবী ভাষায় রোযাকে সওম বলা হয়, যার শাব্দিক অর্থ চুপ থাকা, বিরত থাকা। নিজেকে দৃঢ়তার সাথে নিবৃত্ত রাখা এবং সুদৃঢ় পন্থায় সকল প্রকার চাহিদা সমূহকে সংযত রাখাকেই সওম বা রোযা বলে।

পবিত্র এই মাসে আমাদের সকলের করণীয়, রমযানের কল্যাণরাজী দ্বারা নিজেদের সুসোভিত করা, যেন প্রতিটি সময় কুরআন তেলাওয়াত ও দরসের সৌরভে সুরভিত হয়ে উঠে আমাদের চারপাশ। এছাড়া তারাবি তাহাজ্জুদ প্রভৃতি নফল নামায, দোয়া ও ইবাদতে নিমগ্নতায় যেন জেগে থাকে আমাদের নিঝুম রাত। হাদীসে আছে হযরত রাসূল (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি বিশ্বাসের, আন্তরিকতার ও উত্তম ফল লাভের আশায় রমযান মাসে রোযা রাখে, তার পূর্বের সকল পাপ ক্ষমা করা হবে। [বুখারী ও মুসলিম]

রমযান মাসে যদি অধিক ইবাদত করা যায় তাহলে তা হবে একজন মু'মিনের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত আর এই মহান বরকতময় ইবাদত হলো নামাযে তাহাজ্জুদ। হযরত রাসূলে করীম (সা.)-এর জীবনে রমযানের দিনগুলোর দিকে লক্ষ করলে আমরা দেখতে পাই তিনি (সা.) দিবসগুলোকে সাজিয়েছেন পবিত্র কুরআন পাঠে আর রজনীকে অলঙ্কৃত করেছেন নফল ইবাদতে।

আমাদের যুগ ইমাম, ইমাম মাহ্‌দী (আ.) বলেন, অল্প আহার এবং ক্ষুধা সহ্য করা আত্মশুদ্ধির জন্য আবশ্যক। কেবল অভুক্ত এবং পিপাসার্ত থাকাই রোযার উদ্দেশ্য নয় বরং এর একটি তাৎপর্য এবং প্রভাব আছে যা অভিজ্ঞতার দ্বারা বোঝা যায়। মানুষ যতই কম খায়, ততই তার আত্মশুদ্ধি এবং দিব্যদর্শন শক্তি বৃদ্ধি পায়।

পরিশেষে বলা যায় যে, রোজাদারের উদ্দেশ্য যেন ক্ষুধার্ত থাকাই না হয় বরং তার উদ্দেশ্য যেন খোদা তাআলার যিকর এ রত থাকা এবং দুনিয়া ত্যাগ করে আল্লাহ্‌মুখী হওয়া। যা হৃদয়ের ক্ষুধা মিটাবে এবং আত্মার প্রশান্তি ও পরিতৃপ্তির কারণ হবে।

শবনাম নাজ-দৃষ্টি
ঘাটুরা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

রমযান আমাদের ত্যাগ ও ভালবাসার শিক্ষা দেয়

হিজরী কমরী সনের নবম মাস রমযান। এই মাসটির পূর্ব নাম ছিল নাতিক। রমযান মাস মুসলমানদের জন্য একটি কঠিন পরীক্ষার মাস। এই মাস আমাদের ত্যাগ করার শিক্ষা দেয়। ইবাদতের মানকে আরো উন্নত করার শিক্ষা দেয়। খোদা তাআলার নৈকট্য লাভের সুযোগ করে দেয় পবিত্র রমযান মাস। পবিত্র মাহে রমযানে আমাদের অনেক বেশী নফল ইবাদত করা প্রয়োজন রমযানে নফল ইবদতের গুরুত্ব অপরিসী। রমযান মাসে এলেই রোযার সাথে সাথে যে নফল ইবাদতটির নাম সর্বগ্রে আসে তা হল তারাবীর নামায। এই মাস আমাদেরকে দিয়েছে পরিপূর্ণ কিতাব। যার মাধ্যমে আমরা প্রতিনিয়তই শিক্ষা লাভ করছি। রমযান সেই মাস যাতে কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে। এ কুরআন মানব জাতির জন্য এক মহান হেদায়ত রূপে এবং হেদাতের সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী ও সত্য মিথ্যায় পার্থক্য কারীরূপে অবতীর্ণ করা হয়েছে। অতএব তোমাদের মাঝে যে এ মাসকে পাবে সে যেন এতে রোযা রাখে। এবং খোদা তাআলার ইবাদতে মগ্ন থাকে। (সূরা বাকারা)।

রমযান মাসে শুধু রোযা রাখলেই চলে না তার সাথে কতগুলো বিধি নিষেধ রয়েছে। রোযা রেখে কোন পাপ কার্জ করা যাবে না। কোন কিথা কথা বলা যাবে না, কারো সাথে ঝগড়া করা যাবে না, কাউকে গালি দেয়া যাবে না বরং যদি কেউ আসে তাকে বলতে হবে আমি একজন রোযাদার। এই মাস আমাদেরকে আরো শিক্ষা দেয় রোযার কারণে এই মাসটিতে মানুষের তৃষ্ণা ও জ্বালা বৃদ্ধি পায়। এ মাসের ইবাদত বন্দেগী মানুষের পাপকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে নি:শেষ করে দেয়। এই মাস মানুষের তপস্যা ও সাধনা তার মানে স্রষ্টার প্রতি ভালবাসার উত্তাপ সৃষ্টি করে এবং মানবের প্রতি সহানুভূতি উদ্রেক করে। রমযান মাস ইসলামের জন্য তথা মুসলমানদের জন্য একটি শিক্ষাগ্রহণ করার মাস।

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) রমযান মাস এলে কোমন বেঁধে নেমে পড়তেন ইবাদত বন্দেগী করার জন্য। তাই আমাদের বুঝা প্রয়োজন রমযান আমাদের জন্য কত গুরুত্বপূর্ণ ও মহিমান্বিত মাস। এই মাসে যাতে আমরা কুরআন সবক নেই এবং খোদা তাআলার নৈকট্য লাভ করতে পারি। মহান আল্লাহ্‌ তাআলা আমাদের সবাইকে এই মাসে ইবাদতের মানকে আরো উন্নত করার তৌফিক দিন এবং আল্লাহ্‌ তাআলা আমাদের সকলকে পবিত্র রমযান মাস লাভ করার এবং এর থেকে কল্যাণ ও নেকি হাসিল করার তৌফিক দিন (আমীন)।

ইব্রাহিম আহমদ (মামুন)
ঘাটুরা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

খোদাকে লাভ করার ও আত্মশুদ্ধির মাস রমযান

ইসলামী ইবাদতের গুরুত্বপূর্ণ রোকন বা স্তম্ভ হলো সিয়াম বা রোযা পালন। পবিত্র রমযান আত্মশুদ্ধির মাস, পরম করুণাময় আল্লাহকে একান্ত করে পাওয়ার মাস। এই পবিত্র মাসের পুরস্কার ঘোষণা করতে গিয়ে রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, মহান আল্লাহ্‌ বলেছেন, 'মানুষ যত কাজ করে তা তার নিজের জন্য আর রোযা রাখা হয় কেবল আমার জন্য। সুতরাং আমি নিজেই এর পুরস্কার দিব। রোযার উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তাআলা কুরআনে উল্লেখ করেছেন–'হে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের জন্য রোযা ফরজ করা হলো, যেভাবে তা ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূববর্তীগণের জন্য, যেন তোমরা তাক্‌ওয়া অবলম্বন করতে পার"। প্রাপ্ত বয়স্ক সুস্থ-সবল মুসলিম নর-নারী যাদের পবিত্র রমযান লাভের সৌভাগ্য অর্জিত হয়েছে, তাদের উচিত অবজ্ঞা-অবহেলা আর কোন প্রকার বাহানার আশ্রয় না নিয়ে রোযা রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। কারণ রোযা মানবহৃদয়ে আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস, ভক্তি ও তাক্‌ওয়ার মান বাড়াতে থাকে।

রোযা প্রসঙ্গে হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ আল খামেস (আই.) বলেন, এমাস একদিকে যেমন মু'মিনদের জন্য যারা আল্লাহ্‌র আদেশসমূহ পালন করে তাদের জন্য বরকত নিয়ে আসে, তেমনি শয়তানের সহচর ও সহযোগীদের

জন্য দু:খ-কষ্ট নিয়ে আসে, মানুষ মরণশীল। তাই আমরা কেউ জানিনা আগামী রমযান পাওয়ার সৌভাগ্য আমাদের হবে কিনা। তাই আমাদের সকলের উচিত, এই মাহে রমযানে পূর্বের সকল দোষ-ত্রুটির ক্ষমা চেয়ে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করি আর বেশি বেশি ইবাদত বন্দেগী, দান খয়রাতসহ সব কল্যাণময় কাজে রত হই। মহান আল্লাহ্ তাআলা আমাদের রমযানের বরকত লাভ করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

আহমদ উজ্জ্বল
ঘাটুরা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

রমযানের রোযা মানুষকে মুত্তাকি হওয়ার পথ দেখায়

রমযান হল সেই মাস যাতে নাজিল হয়েছে পবিত্র কুরআন। আল কুরআনের আগমন গোটা মানবজাতির নিরাপদ ও সঠিক পথের সন্ধান দেয়ার জন্য। সঠিক পথ পাওয়ার জন্য যাবতীয় উপায়-উপকরণ, প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলীর সমাহার রয়েছে এই কিতাবে এবং এটি সত্য ও মিথ্যার পার্থক্যকারী। এ ছাড়া আল্লাহ্‌র হক, বান্দার হক, কোনটা সঠিক, কোনটা বাতিল এভাবে সত্য-মিথ্যা ও ন্যায়-অন্যায় পার্থক্য করার যাবতীয় উপকরণ এতে রয়েছে। সর্বোপরি মানবজাতিকে সত্যের পথে চলার নির্দেশনা এ গ্রন্থে বহুবার উল্লেখ হয়েছে। রমযানের রোযা রাখাকে আল্লাহ্ তাআলা তাঁর এই পবিত্র কুরআনে ফরজ করেছেন।

রমযানের রোযা মানুষকে মুত্তাকি হওয়ার পথ দেখায়। ইসলামের পরিভাষায় সাবালকত্ব হওয়ার পর থেকে আমৃত্যু যদি কেউ কঠিন কোন ব্যাধি বা শরিয়তসম্মত নিষেধাজ্ঞার আওতায় না আসে, তাহলে সে আমৃত্যু এ মাসের রোযা পালন করবে।

রোযা মানুষকে সংযমী, ধৈর্যশীল, সব ধরনের লোভ-লালসার উর্ধ্বে রাখাসহ তার আচার-আচরণ ও কথাবার্তার মাধ্যমে অন্য কেউ যাতে আহত বা তিগ্রস্ত না হয় তার শিা দেয়। এছাড়া রোজা আমীর-ফকির, রাজা-প্রজার মধ্যে ভেদাভেদ ছিন্ন করে সবাইকে এক কাতারে শামিল করে। এই তাকওয়া অর্জনের পুরস্কার আল্লাহ নিজ হাতে প্রদানের ঘোষণাও দিয়েছেন। আর তার পুরস্কার হচ্ছে জান্নাত লাভের সাফল্য। এর চেয়ে বড় পুরস্কার আর কী হতে পারে?

রমযানে যদি কেউ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কোন নফল ইবাদত বা দান-খয়রাত করে তাহলে সে এক-একটির জন্য সত্তরটি নেকি অর্জন করবে এবং তার এ নফল ইবাদত ফরজ ইবাদতের সমতুল্য হবে। তাই এ সুযোগ যাতে কোনভাবে হাতছাড়া না হয়, এজন্য আমাদেরকে সাধ্যমতো চেষ্টা করা উচিত। সর্বোপরি, রমযানের প্রথম ১০ দিন হচ্ছে রহমতের, দ্বিতীয় ১০ দিন মাগফিরাতের এবং শেষ অংশ দোজখের আগুন থেকে রেহাই পাওয়ার উপায়। মহান আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সবাইকে রমযানের বাকী দিনগুলো বেশি বেশি ইবাদত বন্দেগীতে রত থেকে কাটানোর তৌফিক দান করুন, আমীন।

ফারহানা মাহমুদ তন্বী
তেজগাঁও, ঢাকা

রমযান মু'মিনের আত্মাকে জ্যোতির্ময় করার উত্তম সুযোগ এনে দেয়

ইসলাম ধর্মের পাঁচটি মূল স্তম্ভের অন্যতম হচ্ছে মাহে রমযানের 'রোযা' পালন। রোযা অর্থ পিপাসায় উত্তপ্ত হওয়া।" হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, "আরবীতে সূর্যের তাপকে 'রময' বলা হয়। আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক তাপের অর্থ আধ্যাত্মিক অনুরাগ ও ধর্ম-কর্মে উদ্দীপনা।"

পবিত্র কুরআন থেকে রমযানের মাহাত্ম্য বোঝা যায়। প্রত্যেক মুসলমানের জন্য সাধনার এক অপূর্ব সওগাত নিয়ে প্রতি বছর মাহে রমযান আসে।

পবিত্র রমযান মাসকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ১ম দশক 'রহমত'; ২য় দশক 'মাগফিরাত' ৩য় দশক 'নাযাত'-এর জন্য। মু'মিন বান্দা সারা বছরই এ পবিত্র মাসের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকেন। রমযানের আগমনে মু'মিনদের আধ্যাত্মিক বাগানে ঘটে নব-বসন্তের সমারোহ! বয়ে আনে ইবাদত বন্দেগীর বাড়তি সুযোগ, যা কাজে লাগিয়ে মু'মিনগণ অন্বেষণ করেন আল্লাহ্‌র নৈকট্য।

মাহে রমযান পাঁচটি ইবাদতের সমষ্টি যা আমাদেরকে শেখায়-দৃঢ়মনোবলের সাথে রোযা রাখা, ফরজ নামায ছাড়াও রাত জেগে নফল ইবাদত, যেমন তারাবীহ্ তাহাজ্জুদ, বিনীতভাবে দোয়া করা, বেশী বেশী করে কুরআন তেলাওয়াত, দান-খয়রাত এবং সকল কু-প্রবৃত্তির কু-প্ররোচনা থেকে পরিত্রাণের চেষ্টা করার শিক্ষা দেয়। রোযা কেবলমাত্র অনাহারে থাকা শিখায় না বরং অধিক হারে 'যিকরে ইলাহী' করার সুযোগ করে দেয়। আত্মার খোরাক হলো যিকরে ইলাহী যা আত্মাকে সতেজ রাখে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, 'রমযান মাস মু'মিনের আত্মাকে জ্যোতির্ময় করার উত্তম সুযোগ এনে দেয় এবং বহুল পরিমাণে 'কাশফ' বা দিব্যদর্শন লাভ করতে পারে।" তাছাড়া নিষ্ঠা ও উত্তম চরিত্রের জন্ম দেয়।"

রোযার মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে তাক্ওয়া অর্জনের মাধ্যমে খোদা তাআলার নৈকট্য অর্জন করা। রমযান আত্মসংযমের, ত্যাগ-সাধনার, পশু-প্রবৃত্তি দমন করার শিক্ষার সাথে ঈমানী শক্তিকে বলীয়ান করার এবং সংযমী মনোভাব গড়ে তোলার অতুলনীয় শিক্ষা দেয়। তাক্ওয়া ভিত্তিক সমাজ গঠনের পাশাপাশি রূহানীয়ত লাভের পূর্ণ সুযোগ এনে দেয়। সারা বছরের "ঘাটতি পুণ্য কর্মগুলি" পুরণের অপূর্ব সুযোগ পেয়ে মু'মিগণ সন্তুষ্টি অর্জনের বাড়তি সুযোগ পান। রমযানে বা-জামাত নামাযে অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়ে মু'মিন ২৭ গুণ বেশী পুণ্য অর্জনের ভাগীদার হতে পারেন।

রমযানের শেষ দশকের নাযাতের অংশে একটি অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ রাত 'লায়লাতুল কদর' এবং 'ইতেকাফ' করার মধ্যে অত্যন্ত অধিক হারে তওবাও ইস্তেগফার করার সুযোগ পৃথিবীর কোন ধর্মেই দেখা যায় না। ক্ষমা চাওয়া বিগলিত হৃদয়ে যা প্রভু খুবই পছন্দ করেন। মূল কথা রমযান মাস আমাদেরকে 'নিয়তের উপর দৃঢ় আমলকারী হওয়ার' শিক্ষা দিয়েছে কারণ কোন কর্মই বিশেষ করে রোযাব্রত পালন দৃঢ়তা ব্যতীত সম্ভব নয়। আমাদের পুণ্যকর্মগুলি সঠিক ভাবে পালনের মাধ্যমে পবিত্র রমযানের মর্যাদা বৃদ্ধি পাক, আমীন।

আনোয়ারা বেগম
রংপুর

ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের অন্যতম হলো রোযা

ইসলাম যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত রোযা তার অন্যতম। বৎসরে একবার একমাসব্যাপী তা পালন করতে হয়। অনেকের ধারণা পানাহার ও স্ত্রীগমন থেকে বিরত থাকাই রোযা। কিন্তু রোযার আসল উদ্দেশ্যে হল সর্বপ্রকার পাপ বর্জন করা এবং সর্বপ্রকার পুণ্য অর্জন করা এবং সুন্দর জীবনের অভিষেক গ্রহণ করা। মূলত রোযার ব্যাপকতা সূদূর প্রসারী। এ রমযান শুরু হওয়ার পূর্ব থেকেই এর জন্য মু'মিনরা প্রস্থতি গ্রহণ করতে থাকেন। কুরআনের আদেশ নিষেধ ও শরীয়তের যাবতীয় শর্ত নিজ জীবনে ষোল আনা বাস্তবায়ন করার উদ্দেশ্যেই রমযান পালিত হয়ে থাকে। আত্মার পরিশুদ্ধতা তো বটেই, এমনকি অনেক শারিরীক ব্যাধিরও উপসম হয়ে যায় এ মাসে।

রমযানের শেষ দশকে এমন এক রাত আসে যাকে লাইলাতুল কদর বলা হয়। লাইলাতুল কদর লাভ করার গুরুত্ব অপরিসীম। প্রত্যেক কাজেরই বিনিময় হয়ে থাকে। এবং বিভিন্ন কাজের বিনিময় বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে আর রোযার বিনিময় হিসেবে আল্লাহ্ বলেন–তুমি বল আমি নিকটেই আছি। আমার মনে হয় রমযানই এর উপযুক্ত সময়। আল্লাহ্ পাক অধমের প্রতি অনুগ্রহ কুরুন এবং প্রিয় বান্দাদের সাথে সামিল করুন। হযরত মুহাম্মদ (সা.) এমনিতেই সারা বৎসর ব্যাপী দান খয়রাত করতেন কিন্তু রমযান এলে হুযূর (সা.) এর দান খয়রাতের মাত্রা ঝড়ের মত সম্প্রসারিত হত। আমাদেরও হুযূর (সা.)-এর অনুসরণ করা দরকার। আল্লাহ্ তাআলার

অনুগ্রহে আমরা আহমদীরা এ মাসে যাকাত সম্পূর্ণ পরিশোধ করে থাকি। আমাদেরকে গরীব মিসকিন আত্মীয় স্বজন অভাবগ্রস্থ অসহায় সবার প্রতিই সহানুভূতি সহায়তা ও সাহায্যের হাত সম্প্রসারিত করা উচিত। সামাজিক কদাচার সম্পূর্ণ পরিহার করা দরকার এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের কোন সুযোগ যাতে হাত ছাড়া না হয় গরীবরা যাতে স্বাচ্ছন্দে রোযা ও ঈদ পালন করতে পারে তার জন্য ফিতরানা সময় মত পরিশোধ করা দরকার। রমযানে তাহাজ্জুদ নামায রীতিমত পাঠের অনুশীলন করা দরকার এবং বাজামাত তারাবীরও আয়োজ করা প্রয়োজন। রোযা ঢালস্বরূপ অতএব এ ঢাল সঠিক প্রয়োগ করে যাবতীয় বিপত্তি অতিক্রম করে আমরা যাতে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারি আল্লাহ্ পাক আমাদের সে তৌফিক দান করুন। আল্লাহ্ পাক আমাদের সবাইকে এ পবিত্র মাসের রহমত, মাগফেরাত ও নাজাতের দ্বার দিয়ে তাঁর সান্নিধ্য দান করুন।

মোহাম্মদ নূরুজ্জামান
বরচর

পবিত্র রমযান আমাদের আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞ বান্দায় পরিণত করে

সওম আরবী শব্দ। সওম বা সিয়াম শব্দের আবিধানিক অর্থ বিরত থাকা। শরীয়তের পরিভাষায় সবহে সাদিক থেকে সূর্যস্ত পর্যন্ত নিয়ত সহকারে পানাহার এবং অশ্লীলতা থেকে বিরত থাকাকে সাওম বা রোযা বলা হয়।

রোযার দ্বারা অন্তর বিগলিত হয় এবং মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের প্রতি কৃতজ্ঞতা বান্দায় পরিণত করে। রোযা সংযমের শিক্ষা দেয়, তাছাড়া মানুষের অন্তরে আল্লাহ্‌র ভয়-ভীতি এবং তাক্ওয়ার গুণ সৃষ্টি হয়। রোযার দ্বারা মানুষের স্বভাবের নম্রতা ও বিনয় সৃষ্টি হয়। রোযার দ্বারা মানব মনে এমন এক নূরানী শক্তি সৃষ্টি হয়, যার দ্বারা মানুষ সৃষ্টির রহস্য সম্বন্ধে অবগত হতে সক্ষম হয়। রোযার বরকতে মানুষ ফিরিশ্‌তার চরিত্রের কাছাকাছি পৌঁছতে পারে এবং মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ এবং পরস্পরের প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি হয়। কেননা যে ব্যক্তি কোন দিন ক্ষুধার্ত পিপাসার্ত থাকেনি সে কখনো মানুষের দুঃখকষ্ট বুঝতে পারে না। অপর দিকে কোন ব্যক্তি যখন রোযা রাখে এবং উপবাস থাকে তখন সে যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারে যে, যারা অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছে তারা যে কত দুঃখ কষ্টে দিনাপিতপাত করছে। আর তখনই অনাহার কিষ্ট মানুষের প্রতি তার অন্তরে সহানুভূতির উদ্রেক হয়।

রোযা পালন করা আল্লাহ্‌র প্রতি গভীর মহব্বতের অন্যতম নিদর্শন। কেননা কারো প্রতি মহব্বত জন্মিলে, তাকে লাভ করার জন্য প্রয়োজনে প্রেমিক পানাহার বর্জন করে। ঠিক তেমনিভাবে রোযাদার ব্যক্তিও আল্লাহ্‌র মহব্বতে দেওয়ানা হয়ে পানাহার পর্যন্ত ভুলে যায়। তাই রোযা হল আল্লাহ্‌র মহব্বতের অন্যতম নিদর্শন। যেভাবে হাদীসে উল্লেখ আছে রোযা ঢাল স্বরূপ। তাই রোযা মানুষকে শয়তানের আক্রমণ থেকে রক্ষা করে। সূফীগণের মতে, রোযা পালনে আত্মা জ্যোতির্ময় হয় এবং বহুল পরিমাণে কাশ্‌ফ অর্থাৎ দিব্য দর্শন লাভ হয়। মহান খোদা তাআলা আমাদের সবাইকে পবিত্র মাহে রমযান থেকে পরিপূর্ণ লাভবান হওয়ার তৌফিক দান করুন, আমীন।

মেনহাজউদ্দিন ঠাকুর (অলক)
সরাইল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

পবিত্র রমযানে ই'তিকাফ-এর সুযোগ ঘটে

ই'তিকাফ আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ হল কোন স্থানে অবস্থান করা। শরীয়তের পরিভাষায় সুন্দর নিয়্যতসহ এমন মসজিদে অবস্থান করা যেখানে ইমাম মুয়াযযীন অবস্থান করছেন। নারীদের বেলায় কোন একটি সৃহ বেছে নিতে হবে অথবা মসজিদে সুন্দর করে পর্দা টাঙিয়ে একান্ত অন্তরালে ই'তিকাফ করতে হবে।

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেছেন 'তোমরা যখন মসজিদে ই'তিকাফ অবস্থায় থাক তখন আপন স্ত্রীদের সাথে মিলিত হয়ো না' (বাকারা : ১৮৮)। 'ইব্রাহীম ও ইসমাঈলকে আদেশ করেছিলাম যে, তোমরা আমার ঘরকে তওয়াফকারী। ই'তেকাফকারী ও রুকু-সিজদাকারীদের জন্য পবিত্র কর (বাকারা : ১২৬)। কুরআনের এ সকল আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় মু'মিন নর-নারীর জন্য ই'তিকাফ একটি বিশেষ পুণ্যের কাজ। আমাদের প্রিয় নবী হযরত রাসূল পাক (সা.) নিজে ই'তিকাফ করতেন এবং তার সাহাবীদেরকে ই'তিকাফ করার জন্য আদেশ দিতেন। রমযান মাসের শেষ দশ দিন তিনি ই'তিকাফে বসতেন। হযরত রাসূল করীম (সা.)-এর ইন্তেকাল পর্যন্ত তিনি এ আমল অব্যাহত রেখেছিলেন। তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁর পবিত্র বিবিগণ ই'তিকাফ করেছেন। হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলে পাক (সা.) রমযান মাসের শেষ দশদিন ই'তিকাফ করতেন এক বছর তিনি কোন কারণ বশত: ই'তিকাফ করেন নি। কিন্তু পরের বছর তিনি বিশদিন ই'তিকাফ করেছিলেন (তিরমিযী) হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন–"যে ব্যক্তি রমযানের শেষ দশদিন ই'তিকাফ করবে সে যেন দু'টি হজ্জ ও দুটি ওমরাহ্ করে (বায়হাকী)।

এ দশদিন মসজিদে অবস্থান করার কারণে প্রতি ওয়াক্ত নামায জামাতের সাথে পড়া যায়। রমযানের শেষ দশদিনের পবিত্র কুরআন খতম করার বিশেষ সুযোগ হয়। সময়ের সঠিক ব্যবহার করা যায়।

ই'তিকাফ করা আল্লাহ্ তাআলার বিধান। তিনি ই'তিকাফ করতে বলেছেন। তাই আমাদের মধ্যে যাদের সৌভাগ্য হয় তারা যেন ই'তিকাফ করি। পবিত্র রমযানের শেষ দশ দিন আল্লাহ্ আমাদের ই'তিকাফ করার তৌফিক দিন, আমীন।

মিসেস আমাতুন নূর এজাজ
নারায়ণগঞ্জ

দৃষ্টি আকর্ষণ

পাঠক কলামে আপনিও অংশ নিন

পাক্ষিক আহমদী'র 'নবীনদের পাতা'র পাশাপাশি প্রতি মাসের শেষ সংখ্যায় পাঠকদের লেখা নিয়ে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে **'পাঠক কলাম'**। এবারের পাঠক কলামের বিষয় **"ইসলামে পর্দার গুরুত্ব"**।

আপনার লেখা ৩০০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।

লেখা পাঠানোর আগে মনে রাখবেন- লিখতে হবে পৃষ্ঠার এক পাশে। লেখার নিচে লেখকের মোবাইল নম্বরসহ পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা দিতে হবে।

আমাদের হাতে লেখাটি আগামী ২০ আগষ্ট, ২০১২-এর মধ্যে পৌঁছতে হবে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা-
সম্পাদকঃ পাক্ষিক আহমদী
(পাঠক কলাম)
৪, বকশী বাজার রোড ঢাকা-১২১১,
e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com

সংবাদ

মজলিস আনসারুল্লাহ তেজগাঁও-এ সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ১১ জুলাই রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ মজলিস আনসারুল্লাহ তেজগাঁও এর উদ্যোগে তেজগাঁও জামে মসজিদ 'আল মসজিদ বায়তুল ইসলাম'-এ সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন মজলিস আনসারুল্লাহর সদর জনাব মোহাম্মদ হাবীব উল্লাহ। পবিত্র কুরআন তেলোওয়াতের মাধ্যমে জলসার কার্যক্রম শুরু হয়। কুরআন তেলোওয়াত করেন জনাব মোহাম্মদ আবদুস সালাম। নযম পাঠ করেন জনাব শাহীন আহমদ। বক্তৃতা পর্বে হযরত রসূল করীম (সা.)-এর জীবনাদর্শ সম্পর্কে পর্যায়ক্রমে বক্তব্য রাখেন জনাব মাকসুদ-উল-হক, যয়ীম, তেজগাঁও, জনাব আলহাজ্জ কায়সার আলম, জেনারেল সেক্রেটারী, তেজগাঁও এবং আলহাজ্জ মওলানা সালেহ আহমদ, মুরব্বী সিলসিলাহ। শেষে বক্তব্য রাখেন মজলিস

আনসারুল্লাহর সদর জনাব মোহাম্মদ হাবীব উল্লাহ। অনুষ্ঠান শেষে জেরে তবলীগদের নিয়ে প্রশ্ন উত্তর পর্ব পরিচালনা করেন আলহাজ্জ মওলানা সালেহ আহমদ, মুরব্বী সিলসিলাহ। দোয়ার মাধ্যমে জলসার কার্যক্রম সমাপ্ত হয়।

এ, এস,এম ওয়াহিদুল ইসলাম

নাসেরাত দিবস পালিত

গত ০১/০৭/২০১২ তারিখে লাজনা ইমাইল্লাহ্ নূরনগর/ঈশ্বরদী নাসেরাত দিবস পালন করা হয়। উক্ত দিবসে কুরআন তেলাওয়াত করেন মাহমুদা জাহান জান্নাত, নযম পাঠ করেন তাহমীনা হক। আহমদীয়াত সম্বন্ধে আলোচনা করেন মাহমুদা জাহান জান্নাত। নামায সম্বন্ধে আলোচনা করেন ফল্গুনী। শেষে পুরস্কার বিতরণ এবং সভানেত্রীর বক্তব্য ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ করা হয়।

রওশন আরা

নূরনগর জামাতে আতফাল দিবস উদযাপিত

গত ০৮/০৭/২০১২ মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া নূরনগর-এর উদ্যোগে আতফাল দিবস উদযাপন করা হয়। বাদ যোহর হতে এশা পর্যন্ত এই অনুষ্ঠানের কার্যক্রম পরিচালিত করা হয়। আহমদীয়া মুসলিম জামাত, নূরনগরের প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ আশরাফ আলী খান এর সভাপতিত্বে দিবসের কাজ শুরু করা হয়। প্রথমে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন কেন্দ্র হতে আগত জনাব মোহাম্মদ জাফর ইকবাল এবং নযম পাঠ করেন জনাব মোহাম্মদ শিমুল বিশ্বাস। এরপর খেলা ধূলা, কুরআন ও নযম প্রতিযোগিতা, আহাদনামা পাঠ বক্তৃতা লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণের পর রাতের নামায ও খাওয়ার শেষে পুরস্কার বিতরণের পর দোয়ার মাধ্যমে দিবসের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মোহাম্মদ আশরাফ আলী খান

কৃতী ছাত্রী

(১) আমাদের বড় মেয়ে সালিয়া এহসান (তনিমা), দাদা মরহুম ওবায়দুর রহমান, নানা মরহুম ফজল আহমদ, দাদু মরহুমা আশরাফুন নেছা, নানু লায়লা বেগম, তেজগাঁও জামাত, এবার ঢাকা বোর্ডের অধীনে হলিক্রস কলেজ থেকে ২০১২ইং সনের এইচ. এস. সি পরীক্ষায় বাণিজ্য বিভাগ থেকে অংশগ্রহণ করে জি.পি.এ ৫ পেয়েছে আলহামদুলিল্লাহ্। সে ওয়াকফে নও এর অন্তর্ভূক্ত। তার ওয়াকফে নও এর নাম্বার ২৭৭০বি। আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সকল ভ্রাতা ভগ্নীর নিকট তার সুস্বাস্থ্য আধ্যাত্মিক উন্নতি ও ভবিষ্যতে সার্বিক সফলতার জন্য দোয়ার আবেদন করছি।

পিতা -এহসান উল আলম
মাতা- মোবারেকা বেগম

(২) ২০১২ সালের এইচ, এস, সি পরীক্ষাতে আমার বড় ভাই-এর কনিষ্ঠ কন্যা তানজিলা হাসান নেছা মানবিক বিজ্ঞান থেকে জিপিএ ৫ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। তাই সকল আহমদী ভাই বোন এর নিকট খাসভাবে দোয়ার আবেদন করছি। মহান আল্লাহ্ তাআলা যেন আমার ভাতিজিকে সর্বক্ষেত্রে উন্নতি দান করেন, আমীন।

নঈম আলম খাঁন

(৩) আমার ছোট মেয়ে কানিজ মাহজেবিন এবছর আলহাজ্জ এয়াকুব আলী গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ থেকে ৫ম শ্রেণীতে জিপিএ ৫ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ। সে নাসেরাতুল আহমদীয়া চট্রগ্রামের সদস্যা। তার সুস্বাস্থ্য ও ভবিষ্যতে সার্বিক সফলতার জন্য দোয়ার আবেদন করছি।

পিতা- এস,এম,মাহামুদ জামান
মাতা- নাছরীন আহমদ চৌধুরী

সন্তান লাভ

গত ০১/০৫/২০১২ আল্লাহ্ তাআলার কৃপায় আমরা এক পুত্র সন্তান লাভ করি, আলহামদুলিল্লাহ্। হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) নবজাতকের নাম প্রদান করেন আফতাফ আহমদ। হুযূর (আই.) আফতাফ আহমদকে ওয়াকফে নও স্কীমে শামীল করেন। তার ওয়াকফে নও নং-১৯৩৮১B । আহমদী ভাই বোনের নিকট আমাদের সন্তানের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ুর জন্য দোয়া প্রার্থনা করছি।

দোয়াপ্রার্থী
পিতা-আহমদ মাজহারুল হক
মাতা-পারুল আক্তার পান্না
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, তেজগাঁও

গত ০৬/০৬/২০১২ আল্লাহ্ তাআলার কৃপায় আমরা এক পুত্র সন্তান লাভ করি, আলহামদুলিল্লাহ্। হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) সদয় হয়ে নবজাতকের নাম প্রদান করেন কাশিফ ইসলাম। হুযূর (আই.) কাশিফ ইসলামকে ওয়াকফে নও স্কীমে শামীল করেন, আলহামদুলিল্লাহ্। তার ওয়াকফে নও নং-৮৩৩৭B। সে যেন একজন সত্যিকারের ইসলামের সেবক হতে পারে তার জন্য সকল আহমদী ভাই বোনের নিকট দোয়া প্রার্থনা করছি।

দোয়াপ্রার্থী
পিতা-মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম মিঠু
মাতা-ফাতেমা ইসলাম রোশনি
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ঢাকা

মজলিস আতফালুল আহমদীয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ৭ দিন ব্যাপী তৃতীয় বার্ষিক শিক্ষা সপ্তাহ-২০১২ পালিত

মজলিস আতফালুল আহমদীয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উদ্যোগে তৃতীয় বার্ষিক শিক্ষা সপ্তাহ২০১২ইং গত পহেলা জুলাই হতে ৭ জুলাই পর্যন্ত সফলতার সাথে অনুষ্ঠিত হয়। পহেলা জুলাই রোজ রবিবার বাদ মাগরীব উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন জনাব সাবিবর আহমদ, জেলা কায়েদ ব্রাহ্মণবাড়িয়া। কুরআন তেলাওয়াত এবং নযম পেশ করেন যথাক্রমে জনাব শেখ আহবাব হুসেন এবং তৌহিদুর রহমান। সভাপতির উদ্বোধনী ভাষণের পর স্বাগত বক্তব্য রাখেন জনাব এখতিয়ার উদ্দিন শুভ, নায়েম আতফাল। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন বিশেষ অতিথি জনাব শেখ সাদী, স্থানীয় কায়েদ, আমন্ত্রিত অথিতি মওলানা নওশাদ আহমদ, মোবাশ্বের মুরব্বী, জনাব মোস্তাক আহমদ খন্দকার, নায়েব আমীর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। সবশেষে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে নির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন জনাব মোহাম্মদ মঞ্জুর হুসেন আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

শিক্ষা সপ্তাহ উপলক্ষ্যে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা নেয়া হয়, প্রতিযোগিতা পর্বে ছিল–কুরআন তেলাওয়াত, নযম, কবিতা আবৃত্তি, স্মৃতি শক্তি, চিত্রাংকন, গণিত বুদ্ধিমত্তা, উন্মুক্ত বক্তৃতা, কুইজ, দরূদ পাঠ, ইন আউট, পয়গামে রেসানী (বাংলা+ইংরেজী), রচনা বিতর্ক প্রতিযোগিতা ইত্যাদি এছাড়াও ছিল বিশেষ আলোচনা সভা, কুমিল্লা শিক্ষা সফর এবং বৃক্ষরোপন কর্মসূচী। এবারের বিতর্কের বিষয় ছিল "দরিদ্রতা দূরীকরণে শিক্ষাই একমাত্র হাতিয়ার"। শিক্ষা সপ্তাহে ৪র্থ দিন নাযেম আতফাল এর দোয়া পরিচালনার মাধ্যমে রাত ২টার দিকে ১৯ জন আতফালের টিম ট্রেন যোগে কুমিল্লা দর্শণীয় স্থান সফরের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে। শিক্ষা সফরে কুমিল্লা বুটানিক্যাল গার্ডেন, চিড়িয়াখানা, শালবন বৌদ্ধবিহার, ময়নামতিসহ বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করা হয়। যোহর এবং আসর নামায কুমিল্লা আহমদীয়া মসজিদে আদায় করা হয়।

৭ই জুলাই ২০১২ রোজ শনিবার বাদ মাগরীব জনাব এস এম ইব্রাহীম রিজিওনাল কায়েদ চট্টগ্রাম রিজিওন এর সভাপতিত্বে সমাপনী ও পুরস্কার বিতরনী অধিবেশন শুরু হয়। কুরআন তেলাওয়াত ও নযম পরিবেশনের পর শুকরিয়া জ্ঞাপনের পর অনেকেই শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন।

সভাপতির সমাপনী বক্তব্যের পর পুরস্কার প্রাপ্তদের হাতে পুরস্কার এবং সনদ পত্র তুলে দেয়া হয়। দোয়ার মাধ্যমে ৩য় বার্ষিক শিক্ষা সপ্তাহের সমাপ্তি ঘটে। উল্লেখ্য, শিক্ষা সপ্তাহের সংবাদ স্থানীয় ২টি সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হয়।

রায়হান আহমদ

লাজনা ইমইল্লাহ্ নারায়ণগঞ্জের ১৯তম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

গত ০৭/০৭/২০১২ রোজ শনিবার লাজনা ইমাইল্লাহ্ নারায়ণগঞ্জের উদ্যোগে ১৯তম বার্ষিক ইজতেমা মহান আল্লাহ্ তাআলার ফজলে সাফল্যজনকভাবে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত ইজতেমায় সভানেত্রী ছিলেন মাসুদা পারভেজ প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্ নারায়ণগঞ্জ। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাকসুদা রহমান, প্রাক্তন সদর, লাজনা ইমাইল্লাহ্ বাংলাদেশ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্র হতে আগত মেহমান ফাতেমা নুসরাত, জেবিন হোসেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও বাংলা তরজমা পাঠ করেন সুফিয়া বেগম। ইজতেমায়ী দোয়া ও আহাদনামা পাঠ করেন সভানেত্রী। অত:পর ইজতেমার উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন জনাব মনিরুজ্জামান খোকন, আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, নারায়ণগঞ্জ। স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন ফারহানা চৌধুরী, চেয়ারম্যান ইজতেমা কমিটি। বাৎসরিক রিপোর্ট পেশ করেন উম্মে কুলসুম চায়না, জেনারেল সেক্রেটারী, লাজনা ইমাইল্লাহ্ নারায়ণগঞ্জ। প্রধান অতিথি মাকসুদা রহমান এবং বিশেষ অতিথি ফাতেমা নুসরাত এবং জেবিন হোসেন ইজতেমায় উপস্থিত লাজনা ও নাসেরাত বোনদের উদ্দেশ্যে নসিহতমূলক বক্তব্য প্রদান করেন।

অত:পর বাংলা উর্দু নযম পাঠ করেন যথাক্রমে আয়েশা সিদ্দিকা বিপাশা, সুরাইয়া নাসের তুলি। বাংলা নযম (দলীয়) বুশরা আক্তার, সুলতানা নাসিরা সোনিয়া এবং খাওলাদ্বীন উপমা। অত:পর স্থানীয় লাজনা বোনরা বিভিন্ন বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে ১৯তম বার্ষিক ইজতেমার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। এতে ৯৫ জন লাজনা এবং ৬৯ জন নাসেরাত ও শিশু উপস্থিত ছিলেন।

খিলাফত দিবস পালিত

লাজনা ইমাইল্লাহ্ নারায়ণগঞ্জ এর উদ্যোগে গত ০১/০৬/২০১২ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ খিলাফত দিবস পালন করা হয়। স্থানীয় মজলিসের প্রেসিডেন্ট মাসুদা পারভেজ এর সভানেত্রীত্বে ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের কাজ শুরু হয়। কুরআন তেলাওয়াত ও বাংলা তরজমা পাঠ করেন রেহানী জসীম। উক্ত অনুষ্ঠানে উর্দু ও বাংলা নযম আবৃত্তি করেন মরিয়ম সিদ্দিকা ও খাওলাদিন উপমা। অত:পর বক্তৃতা পর্বে যুগ খলীফার আনুগত্য সম্পর্কে সুরাইয়া নাসের তুলি। নেযামে লিখাফত ও ইতায়াত সম্পর্কে সুফিয়া বেগম এবং আহমদীয়া জামাতের সত্যতার নিদর্শন হিসেবে খিলাফত সম্পর্কে ফারহানা চৌধুরী বক্তব্য রাখেন। সভানেত্রীর ভাষণ ও ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে খিলাফত দিবসের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। এতে ২৮ জন লাজনা ও ২২ জন নাসেরাত উপস্থিত ছিলেন।

উম্মে কুলসুম চায়না

লাজনা ইমাইল্লাহ পুরুলিয়ার বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

গত ২৫/০৬/২০১২ রোজ সোমবার লাজনা ইমাইল্লাহ্ পুরুলিয়ার উদ্যোগে বার্ষিক ইজতেমা ২০১২ সফলতার সাথে সম্পন্ন হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত ইজতেমা সকাল ১০টায় প্রেসিডেন্ট লাজনা ইমাইল্লাহ্ পুরুলিয়ার সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অধিবেশ শুরু হয়। প্রথমেই কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন সীমা আক্তার, নযম পরিবেশন করেন লতা আক্তার। এতে দ্বীনিমালুমাত বিভিন্ন প্রতিযোগিতা নেয়া হয়। শেষে প্রেসিডেন্ট লাজনার সভাপতিত্বে পুস্কার বিতরণী ও সমাপনী অধিবেশন শুরু হয়।

শাহানাজ আক্তার

শোক সংবাদ

জনাব রফিক আহমদ পিতা-মরহুম মোহাম্মদ চান মিয়া মাতা-মরহুমা লাজিমুন নেছা গত ২০ জুলাই /২০১২ শুক্রবার সকাল ৭-৩০ মিঃ এর সময় হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে নাখাল পাড়াস্থ তাঁর নিজ বাসবভনে ইন্তেকাল করেন। (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫০ বছর। তিনি স্ত্রী, ৪ কন্যা ও আত্মীয়-স্বজনসহ বহু গুণগ্রাহী ও শুভাকাঙ্খী রেখে গেছেন। মরহুম তাঁর পিতা-মাতার ৮ সন্তানের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ ও ৩ ছেলের মধ্যে তৃতীয় ছেলে ছিলেন। তিনি পঞ্চগড় নিবাসী এডভোকেট আব্দুল মজিদ সাহেবের বড় মেয়ের জামাতা ছিলেন। মরহুম একজন অনুরাগী দায়ী ইলাল্লাহ্ ও মূসী ছিলেন। তাঁর একটা বিশেষ গুণ ছিল তিনি হাস্যোজ্জ্বল মুখে সদালাপের মাধ্যমে চেনা-অচেনা সবাইকে খুব সহজে আপন করে নিতে পারতেন। মরহুম একজন আদর্শ সমাজ সেবী ও মেহমান নেওয়াজী ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পরপরই এলাকাবাসী নন-আহমদীগণ ব্যানারে শোকবাণী লিখে তাঁর উদ্দেশ্যে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। এতে বুঝা যায় যে, মরহুম সবার কাছেই সমাদৃত ছিলেন।

মরহুম রফিক আহমদ স্বল্প বয়স থেকেই জামাতের একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন। তিনি মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশ আমেলার একজন সদস্য ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ ন্যাশনাল আমেলার সহকারী উমুরে আমা'র দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি জামাতের যে কোন আদেশ উপদেশ অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে পালন করতেন ও নিজ জামাতের সদস্যগণের দ্বারা বাস্তবয়নের চেষ্টা করতেন। তিনি একান্ত চেষ্ট ও শ্রম দিয়ে তাঁর বাড়ী সংলগ্নে একখানা পাকা মসজিদ নির্মাণ করেছেন। এ মসজিদ ও তৎসংলগ্ন আহমদীগণ যখন আশেপাশের নন-আহমদীদের দ্বারা চরম আক্রমণের সম্মুখীন হয় তখন তিনি বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিয়ে অত্র জামাতের স্বল্প সংখ্যক সদস্যদের সমন্বয়ে কঠিন এই মোখালেফাতের ষড়যন্ত্র অত্যন্ত দক্ষতার সাথে প্রতিহত করেছেন। দুষ্ট প্রকৃতিজনদের কঠিন এই মোখালেফাতের কঠোর চিত্র এমটিএ-এর মাধ্যমে বিশ্ব আহমদীয়াতের অংগনে ফলাও করে প্রচার হয়েছে। তিনি চানতারা জামাতের মোখালেফাত নিরসনেও বাংলাদেশ জামাতের বৃহদাকারে জমি ক্রয় করার কাজেও একনিষ্ঠ শ্রম দিয়েছেন। আমরা মরহুমের এসব আবেদনময়ী কর্মসমূহকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি।

উল্লেখ্য যে, নাখালপাড়াস্থ কবরস্থানে তাঁকে কবর দিতে গেলে দুষ্ট স্বভাবের কতক মোল্লা এ কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু তাঁরই বন্ধু মহলের কতব সুজনের তীব্র প্রতিবাদের ফলে তা বাস্তবায়িত হয়নি। আমরা সেসব মহত ব্যক্তিদের মহান কাজের প্রশংসা করছি ও দোয়া করছি। খোদাতাআলা তাদেরকে মানবসেবামূলক অনুরূপ আরো অনেক কাজ করার তৌফিক দান করুন।

মরহুম নেযামে খিলাফতের চতুর্থ খলীফার সাথে লন্ডনে এবং পঞ্চম খলীফার সাথে কাদিয়ানে সাক্ষাৎ করে তাদের পাগড়ী চেয়ে এনে তা তিনি অত্যন্ত যত্ন সহকারে নিজ গৃহে সংরক্ষণ করে রেখেছেন। বিষয়টি মরহুমে খলীফাগণের প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসারই পরিচয়াক।

তিনি নেযামে খিলাফতের সাথে ভালবাসাপূর্ণ সম্পর্ক রেখে পূর্ণ জীবন অতিবাহিত করে গিয়েছেন। আমরা জামাতের এমন একজন কর্মঠ ও একনিষ্ঠ কর্মীকে হারিয়ে গভীরভাবে শোকাহত ও মর্মাহত। মরহুমের পরিবারের সকল সদস্যসহ নিকট আত্মীয় ও শুভানুধ্যায়ীদের সহমর্মিতা ও সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। পরম করুনাময় খোদা তাআলার কাছে দোয়া করছি তিনি মরহুমের সকল কর্মকে সাদরে গ্রহণ করুন এবং তাঁর বিদেহী আত্মাকে জান্নাতুল ফেরদৌসে উচ্চ মাকামে স্থান দান করুন। খোদা তাঁর পরিবারের সকলকে সাবুরে জামিল দান করুন আর তাঁর রেখে যাওয়ার প্রজন্মের মাঝে অনুরূপ নেক কাজের প্রবাহ চলমান রাখুন, আমীন।

মরহুমের
স্নেহভাজন ভাগ্নে
মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহী
দূর্গারামপুর

বোরকা সম্বন্ধে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বলেন-

"বোরকা সম্বন্ধে সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে, বোরকা যেন জাকজমক ও আরম্বড়পূর্ণ না হয়। বোরকার কাপড় যেন এমন না হয় যা মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, আর এর কাপড় কাটা ও শেলাইয়ের সময় যেন লৌকিকতা অবলম্বন না করা হয়। বরং বোরকা যেন সাদামাটা কাপড় দিয়ে সাধারণভাবে শেলাই করে ঢিলে ঢালা করে তৈরী করা হয়, যাতে শরীরের গঠন বা কাঠামো গোপন থাকে। বোরকা এমনভাবে বানাতে হবে যাতে পর্দার প্রকৃত উদ্দেশ্য পূর্ণ হয় এবং সর্বদা খেয়াল রাখতে হবে বোরকাই যেন লৌকিকতার কারণ না হয়ে দাঁড়ায়, আর দেহের গঠন যেন প্রকাশ না পায়।"

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী জুবিলী ২০১৩ পালনের জন্যে দোয়া ও ইবাদতের আধ্যাত্মিক কর্মসূচী

১ প্রত্যেক মাসে একটি নফল রোযা রাখুন। এজন্যে প্রত্যেক জামাতে স্থানীয়ভাবে মাসের শেষ সপ্তাহে একদিন নির্ধারিত করে নিন।

২ প্রত্যেকদিন দু' রাকাআত নফল নামায (ইশার পর থেকে ফজরের আগ পর্যন্ত অথবা যুহরের নামাজের পর) আদায় করুন।

৩ সূরা ফাতিহা কমপক্ষে প্রত্যহ সাতবার পাঠ করুন।

৪ রাব্বানা আফ্‌রিগ আলাইনা সাব্‌রাওঁ ওয়াসাব্বিত আক্বদামানা ওয়ানসুরনা আলাল ক্বাওমিল কাফিরীন [সূরা বাকারা ঃ ২৫১] প্রত্যহ কমপক্ষে ১১ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে অগাধ ধৈর্য দান কর এবং আমাদেরকে দৃঢ়তা প্রদান কর এবং কাফির জাতির বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।

৫ রাব্বানা লা তুযিগ ক্বুলূবানা বা'দা ইয্‌ হাদাইতানা ওয়া হাবলানা মিল্লাদুনকা রাহমাতান ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্‌'হাব [সূরা আলে ইমরান– ৯] প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে হেদায়াত দেয়ার পর আমাদের হৃদয়কে বক্র হতে দিও না এবং তোমার নিজ সন্নিধান থেকে আমাদেরকে রহমত দান কর; নিশ্চয় তুমিই মহান দাতা।

৬ আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফি নুহূরিহিম ওয়া না'উযুবিকা মিন শুরূরিহিম [আবূ দাউদ ঃ কিতাবুস সালাত] প্রত্যহ কমপক্ষে ১১ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমরা [অবিশ্বাসীদের মোকাবেলায়] তোমাকে তাদের অন্তরে [ঢালস্বরূপ] রাখছি আর তাদের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

৭ আস্‌তাগফিরুল্লাহা রব্বি মিন কুল্লি যাম্বিওঁ ওয়াআতুবু ইলায়হে। প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ আমি আমার প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহতাআলার নিকট আমার সমুদয় পাপ হতে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তারই সমীপে প্রত্যাবর্তন করি।

৮ সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সুবহানাল্লাহিল আযীম আল্লাহুম্মা সল্লি 'আলা মুহাম্মদিওঁ ওয়া আলি মুহাম্মদ। (প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন)

অর্থ ঃ আল্লাহ্‌তাআলা তাঁর প্রশংসাসহ অতি পবিত্র। তিনি অতি পবিত্র অতি মহান। হে আল্লাহ্‌! মুহাম্মদ (সঃ)-এর প্রতি ও তাঁর অনুসারীদের প্রতি আশিস বর্ষণ কর।

৯ দুরূদ শরীফ। (প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন)

হুযূর (আইঃ)-এর এই আহ্বান বাস্তবায়ন করার জন্য স্থানীয় জামাত ও জামাতের সমস্ত অঙ্গ সংগঠনকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষীকি জুবিলী ২০১৩ ন্যাশনাল কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১।

بسم الله الرحمن الرحيم

এমটিএ, বাংলাদেশ স্টুডিও

আগস্ট, ২০১২, এমটিএ বাংলা অনুষ্ঠানের সম্ভাব্য অনুষ্ঠানসূচী (প্রচার সময় সন্ধ্যা ৭ টার পর)

তারিখ	বিষয়বস্তু
০১/০৮/১২, বুধ URDV 485 (পুণঃ)	(১) রমজানের মাসলা মাসায়েলঃ মাওলানা ইমদুর রহমান সিদ্দিকী (২) নাতে রসুল (সাঃ), (৩) বিভিন্ন ধর্মে রোজা
০৪/০৮/১২, শনি URDV 486 (পুণঃ)	(১) রমজানে কুরআন নাজিলের তাৎপর্যঃ মাওলানা বশিরুর রহমান, (২) নাতে রসুল (সাঃ), (৩) রমজান বিষয়ক আলোচনা - লাজনা পরিবেশিত।
০৬/০৮/১২, সোম URDV 487 (পুণঃ)	(১) আত্মশুদ্ধির মাস রমজানঃ আলহাজ্ব মাওলানা সালেহ আহমদ, (২) নাতে রসুল (সাঃ), (৩) রমজানের নানা দিকঃ মাওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী।
০৭/০৮/১২, মঙ্গল URDV 537 (নতুন)	(১) তেলাওয়াতে কুরআনঃ মাওলানা ফিরোজ আলম, (২) দরসে কুরআনঃ আলহাজ্ব মাওলানা সালেহ আহমদ (৩) রমজান বিষয়ক আলোচনাঃ তফসীরে কবীরের আলোকে-মাওলানা জাফর আহমদ ও মোয়াল্লেম মাহমুদ আহমদ সুমন, (৪) ঢাকার ইফতারী বাজার - একটি প্রামান্য প্রতিবেদন।
০৮/০৮/১২, বুধ URDV 538 (নতুন)	(১)তেলাওয়াতে কুরআনঃ মাওলানা ফিরোজ আলম, (২) দরসে কুরআনঃ আলহাজ্ব মাওলানা সালেহ আহমদ, (৩) রমজন বিষয়ক আলোচনাঃ তফসীরে কবীরের আলোকে - মাওলানা জাফর আহমদ ও মোয়াল্লেম মাহমুদ আহমদ সুমন, (৪) নাত
১১/০৮/১২, শনি URDV 539 (নতুন)	(১) তেলাওয়াতে কুরআনঃ মাওলানা ফিরোজ আলম, (২) দরসে কুরআনঃ আলহাজ্ব মাওলানা সালেহ আহমদ, (৩) দরসে হাদিসঃ আলহাজ্ব মাওলানা সালেহ আহমদ, (৪) রমজান বিষয়ক আলোচনাঃ ফিকাহ আহমদীয়ার আলোকে - মাওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান ও এহসানুল হাবীব জয়।
১৩/০৮/১২, সোম URDV 540 (নতুন)	(১) তেলাওয়াতে কুরআনঃ আলহাজ্ব মাওলানা অব্দুল আযীয সাদেক, (২) দরসে কুরআনঃ আলহাজ্ব মাওলানা সালেহ আহমদ, (৩) রমজান বিষয়ক আলোচনাঃ ফিকাহ আহমদীয়ার আলোকে - মাওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান ও এহসানুল হাবীব জয়।
১৪/০৮/১২, মঙ্গল URDV 541 (নতুন)	(১) তেলাওয়াতে কুরআনঃ মাওলানা ফিরোজ আলম, (২) দরসে কুরআনঃ আলহাজ্ব মাওলানা সালেহ আহমদ,(৩) রমজান বিষয়ক আলোচনাঃ ফিকাহ আহমদীয়ার আলোকে - মাওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান ও এহসানুল হাবীব জয়, (৪) যাপিত জীবনে রমজানঃ আলী আহমদ মাস্টার, আব্দুল মজিদ সরদার, ইউনুস আলী প্রামানিক, কামাল উদ্দীন ও এহসানুল হাবীব জয়।
১৫/০৮/১২, বুধ URDV 542 (নতুন)	(১) তেলাওয়াতে কুরআনঃ আলহাজ্ব মাওলানা অব্দুল আযীয সাদেক, (২) দরসে কুরআনঃ আলহাজ্ব মাওলানা সালেহ আহমদ, (২) রমজান বিষয়ক আলোচনাঃ তফসীরে কবীরের আলোকে - মাওলানা জাযর আহমদ ও মোয়াল্লেম মাহমুদ আহমদ সুমন, (৩) ঈদের তাৎপর্যঃ মাওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান ও এহসানুল হাবীব জয়।
১৮/০৮/১২, শনি	URDV 494 পুণঃপ্রচারঃ ঈদের বিশেষ অনুষ্ঠান ২০১১
২০/০৮/১২, সোম	URDV 543 নতুনঃ ঈদের বিশেষ অনুষ্ঠান ২০১২ (চট্টগ্রামের শিশুদের পরিবেশিত, ফয়েস' লেকে ধারণকৃত)।
২১/০৮/১২, মঙ্গল	URDV 543 পুণঃপ্রচারঃ ঈদের বিশেষ অনুষ্ঠান ২০১২ (চট্টগ্রামের শিশুদের পরিবেশিত, ফয়েস' লেকে ধারণকৃত)।
২২/০৮/১২, বুধ	URDV 435 পুণঃপ্রচারঃ ঈদের বিশেষ অনুষ্ঠান ২০১০
২৫/০৮/১২, শনি	URDV 543 পুণঃপ্রচারঃ ঈদের বিশেষ অনুষ্ঠান ২০১২ (চট্টগ্রামের শিশুদের পরিবেশিত, ফয়েস' লেকে ধারণকৃত)।
২৭/০৮/১২, সোম URDV 535 (পুণঃ)	(১) বক্তৃতাঃ "বাংলাদেশে আহমদীয়াতের শতবার্ষিকী ও আমাদের কর্তব্য" - আহমদ তবশির চৌধুরী; (২) পুস্তক আলোচনাঃ 'আহমদীয়াতের ইতিহাসে বাংলার স্মরনীয় ব্যক্তিত্ব" পর্ব- ৭, এবারের ব্যাক্তিত্বঃ মুন্সি দৌলত আহমদ খাদেম। অংশগ্রহনেঃ প্রফেসর মীর মোবাশ্বের আলী, প্রিন্সিপ্যাল জাফর আহমদ ও মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল।
২৮/০৮/১২, মঙ্গল URDV 461 (পুণঃ)	(১) বক্তৃতাঃ ভারসাম্যপূর্ণ ও সুখী ইসলামী দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবনঃ মাওলানা মোবাশ্বের আহমদ কাহলুন - ৮৭তম জলসা সালানায় প্রদত্ব (বাংলা এবং Urdu)
২৯/০৮/১২, বুধ URDV 462 (পুণঃ)	(১) বক্তৃতাঃ হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) এর সত্যতা এবং তাঁকে মান্য করার গুরুত্ব - হাফেজ মাওলানা আবউ তাহের; (২) হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) সূচীত আধ্যাত্মিক বিপ্লবঃ আলহাজ্ব মাওলানা সাএলহ আহমদ।

- *প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যা ৬ টায় - লন্ডনের বায়তুল ফুতুহ মসজিদ থেকে যুগ খলিফার জুমুয়ার খুতবার সরাসরি সম্প্রচার এবং খুতবার পর কেন্দ্রীয় বাংলা ডেস্কের অনুষ্ঠান*
- *প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭ টায়— পূর্ববর্তী জুমুয়ার খুতবার পুণঃপ্রচার*
- *প্রতি রবিবার সন্ধ্যা ৭ টায়— কেন্দ্রীয় বাংলা ডেস্কের অনুষ্ঠান*
- *২০ আগষ্ট, ২০১২ বেলা ৩ টায়— বায়তুল ফুতুহ মসজিদ থেকে যুগ খলিফার ঈদের খুতবা সরাসরি সম্প্রচার*

নিয়মিত এমটিএ দেখুন, নিজের ও পরিবারের হেফাজত করুন

প্রচারেঃ এমটিএ বাংলাদেশ স্টুডিও
যোগাযোগঃ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ, ৪, বকশি বাজার রোড, ঢাকা - ১২১১
Email: atabshir@hotmail.com Web: www.mta.tv; www.ahmadiyyabangla.org; www.alislam.org

Right Management Consultants

Software Developer & MIS Solution Provider

Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে বয়'আত গ্রহণের ৫ম ও ৬ষ্ঠ শর্তাবলী

বয়'আত গ্রহণকারী সর্বান্তকরণে অঙ্গীকার করবে

৫। সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদা তাআলার সাথে বিশ্বস্ততা রক্ষা করবে। সকল অবস্থায় তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে। তাঁর পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করে নিতে প্রস্তুত থাকবে এবং সকল অবস্থায় তাঁর ফয়সালা মেনে নিবে। কোন বিপদ উপস্থিত হলে পশ্চাদপদ হবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হবে।

৬। সামাজিক কদাচার পরিহার করবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হবে না। কুরআনের অনুশাসন ষোলআনা শিরোধার্য করবে এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্ ও রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতিক্ষেত্রে অনুসরণ করে চলবে।

সৌজন্যে :

ডিলার- জনতা সেনেটারী
হাজী পাড়া, রামপুরা, ঢাকা

গাজী
গুণে মানে সেরা
পানির পাম্প ব্যবহার করুন

New Vol. No. 75 | 2nd Issue

Fortnightly The Ahmadi

31th July, 2012 Tk. 15.00
Regd. No. D. A.-12

Printed and Published by **Muhammad Nurul Islam Mithu** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
Phone: 7300808, 7300849 Fax: 880-2-7300925, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com